রবীন্দ্রসাহিত্যে বৌদ্ধসংস্কৃতি



শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

রবীন্দ্রসাহিত্যে বৌদ্ধসংস্কৃতি

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

রবীন্দ্রসাহিত্যে বৌদ্ধসংস্কৃতি

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

প্রকাশ কাল

প্রথম সংস্করণ

আশ্বিনী পূর্ণিমা, ২৫৪১ বুদ্ধাব্দ

১৪০৪ বাংলা, ১৯৯৭ ইংরেজী

প্রকাশক

শ্রী সঞ্চয় কুমার বড়ুয়া (বাবু)
শ্রী বিজয় বড়ুয়া (লিটন)
শ্রী অজয় বড়ুয়া (মিল্টন)

প্রচ্ছদ

সলিল বড়ুয়া

মুদ্রণে

অন্তিকা প্রেস
১০, আন্দরকিল্লা
সাধনা ঔষধালয়ের পার্শ্বে, চট্টগ্রাম।

প্রাপ্তিস্থান

বিশ্বশান্তি প্যাগোডা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

মূল্যঃ ৩৫ টাকা মাত্র।

উৎসর্গ

স্বর্গত পিতামহ বাবু অন্নদা চরণ বড়ুয়া মহোদয় রাংগুনীয়ার নজরেরটিলা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বৌদ্ধপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন ব্যবসায় পরিচালনা করে যশস্বী হয়েছেন। এদেশের সূর্যসন্তানদের ন্যায় তিনিও ছিলেন কর্মবীর। সত্যাশ্রয়ী, ধর্মপরায়ণ এবং সমাজসেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণা আমাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ সমাজহিতৈষণায় উদ্বুদ্ধ করেছে। সেই প্রাতঃ স্মরণীয় পিতামহ স্বর্গত বাবু অন্নদা চরণ বড়ুয়া ও তাঁর পত্নী পিতামহী স্বর্গতা সুকৃতি বালা বড়ুয়ার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে "রবীন্দ্রসাহিত্যে বৌদ্ধসংস্কৃতি" শীর্ষকগ্রন্থখানি উৎসর্গ করা হল।

শ্রদ্ধাবনত
শ্রীসঞ্জয় কুমার বড়ুয়া (বাবু)
শ্রীবিজয় বড়ুয়া (লিটন)
শ্রীঅজয় বড়ুয়া (মিল্টন)



স্বর্গত বাবু অন্নদা চরণ বড়ুয়া ও তার পত্নী স্বর্গতা সুকৃতি বালা বড়ুয়া

প্রকাশকের কথা

কৈশোরে বিভিন্ন স্থানে চীবর দানানুষ্ঠানে পন্ডিত প্রবর শ্রদ্ধেয় জ্যোতিঃ পাল মহাথের মহোদয়ের বৈচিত্র্যময় পান্ডিত্যপূর্ণ ধর্মদেশনা শ্রবণে অনেকের ন্যায় আমিও অভিভূত হই এবং ধর্ম ও ধর্মকথিকের প্রতি অন্তরে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়। তখন থেকে কল্পনা করেছিলাম তাঁর প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শনের জন্য সময় সুযোগের কথা।

মহাথের মহোদয়ের অবদান নানা দিকে। তিনি ধর্ম, ইতিহাস, রাজনীতি, ভ্রমনকাহিনী, পালি, সংস্কৃত, হিন্দী নানা গ্রন্থ থেকে বঙ্গানুবাদ ইত্যাদি বহু গ্রন্থের প্রণেতা। দেশ বিদেশে সমাজকল্যাণ ও জনহিতকর বহুবিধ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। রাজনীতির ক্ষেত্রে ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে বাংলাদেশের স্বপক্ষে বিবেকের কণ্ঠস্বররূপে জনমত সংগঠনের মাধ্যমে স্বীকৃতির সন্ধানে দক্ষিণ-পূর্ব বৌদ্ধ দেশসমূহে পরিভ্রমণ করেছিলেন। বহু সংগঠনের প্রধানরূপে তাঁর অবদান অতুলনীয়। এজন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংগঠন থেকে সম্মানজনক পদক পুরস্কার ও সনদ পেয়েছেন। তিনি বাংলাদেশের বৌদ্ধসমাজে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি সর্বশেষ পুরস্কার ও সনদপত্র লাভ করলেন জাতিসংঘ থেকে বিশ্বনাগরিক রূপে।

কালক্রমে ১৯৯৬ সালের জুন মাসে মহাথের মহোদয় দক্ষিণ কোরিয়া সফরে এলে তাঁর সাথে আলাপ আলোচনায় তিনি জানালেন যে "রবীন্দ্রসাহিত্যে বৌদ্ধসংস্কৃতি" শীর্ষক পুস্তকের একটি পান্ডুলিপি লেখা সমাপ্তির পথে। যদি তুমি পার কাজটা করে দিও। আমি সানন্দে সেটা প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। আমি মনে করি শ্রদ্ধেয় মহাথের মহোদয় আমাকে উক্ত অমূল্য গ্রন্থখানি প্রকাশনার দায়িত্ব দিয়ে আমাদের যুবসমাজকে সদ্ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজ শ্রীবর্দ্ধনে অধিকহারে এগিয়ে আসার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। গ্রন্থখানি প্রকাশে আমাদের পিতা বাবু অরবিন্দ ও স্নেহময়ী মাতা শ্রীমতি সন্ধ্যা রানী বড়ুয়া উৎসাহিত করেছেন। যোগাযোগ ও বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছে ছোট ভাই শ্রীমান বিজয় ও অজয় বড়ুয়া। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বৌদ্ধ সাহিত্য-সংস্কৃতির উপাদান ব্যতীত তার সাহিত্যকর্ম এতটুকু ব্যাপ্তি লাভ করত না। বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে ধারণ করে রবীন্দ্রসাহিত্য যেভাবে সমৃদ্ধি লাভ করেছে তেমনি অনুসন্ধিৎসু পাঠক পাঠিকাদের জ্ঞান ভান্ডারকে উক্তগ্রন্থখানি নিঃসন্দেহে অধিকতর সমৃদ্ধ করবে আশা রাখি। তবেই "রবীন্দ্র সাহিত্যে বৌদ্ধসংস্কৃতি" শীর্ষক গ্রন্থখানির প্রকাশ সার্থক হবে।

"বুদ্ধশাসন চিরস্থিতি লাভ করুক"

শ্রীসঞ্জয় কুমার বড়ুয়া (বাবু)
শ্রীবিজয় বড়ুয়া (লিটন)
শ্রীঅজয় বড়ুয়া (মিল্টন)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার বিদ্যাবুদ্ধি প্রাচীন পালি সংস্কৃত টোলের শিক্ষায় সীমিত। আধুনিক কালের প্রাতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষাগত অভিধা আমার নেই। ছোটকালে শুনতে পেয়েছিলাম-কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নাম-যশ, কীর্ত্তি, সুখ্যাতি। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিখ্যাত, বিশ্বকবি। শাস্ত্রে আছে, আত্মানাং সর্বভূতেষু, সর্ব ভূতানাং চাত্মনি। যিনি বিশ্বের সর্ব জীবের মধ্যে নিজকে এবং নিজের মধ্যে বিশ্বের সর্ব জীবকে উপলব্ধি করেন, তিনি বিশ্ব বিখ্যাত। তাঁর অধিষ্ঠান সকলের অন্তরে, সবাই তাঁর অন্তরতর। তিনি সাম্য সৌম্য দৃষ্টিসম্পন্ন মহান ব্যক্তিত্ব। মহাসমুদ্র দেখে কূপের ব্যাং-এর লম্ফ ঝম্ফ দেওয়ার ন্যায় আমি ছোটকালে নিজে নিজে রবীন্দ্রনাথের বই পুস্তক পড়তে আরম্ভ করেছিলাম সত্য; কিন্তু তাঁর গভীর ভাব ভাষা কিছুই আমার বোধগম্যে আসত না। ইতোমধ্যে অন্যান্য বিষয় নিয়ে পঠন পাঠন করলে ও রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে দিইনি। আজ সপ্তাশীতি বছর জরা বার্ধক্যে উপনীত হলেও ফাঁকে ফাঁকে রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ করে থাকি। আমি তাতে অপেক্ষাকৃত আনন্দ ও গৌরব বোধ করি। জানি না সে মহা সমুদ্রের গভীরতা কতটুকু বুঝেছি, কতটুকু উপলব্ধি করেছি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে প্রত্যক্ষে পরোক্ষে, প্রচ্ছন্ন শক্তির আকারে অনেক ক্ষেত্রে বৌদ্ধ শিক্ষা সংস্কৃতি, নীতি আদর্শ যে নিহিত আছে তা একান্ত সত্য। তদ্ধেতু আমার এ ক্ষীণ প্রয়াস।

রবীন্দ্র সাহিত্যে বৌদ্ধ সংস্কৃতি নামক পুস্তক রচনায় নূতনত্ব কিছু নেই। ইহা পাঠ করে মানুষ উপকৃত হবে, পণ্ডিত মহল আনন্দ লাভ করবেন, দেশের সমাজের কল্যান সাধিত হবে-এই কল্পনাও আমার নেই। তবে রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ করে আত্ম-তুষ্টি, আপন চিত্ত-বিনোদন লাভ করব-এই স্পৃহা অন্তরে পরিস্ফুট আছে। অন্যান্য আলোচক গবেষকগণ যেমন নিজ নিজ যুক্তি প্রযুক্তি সপ্রমাণ করার এবং বোধগম্যে সুগম করার লক্ষ্যে রবীন্দ্রসাহিত্যচর্চায় বিদেশী বৈজ্ঞানিক দার্শনিক গণের যুক্তির অবতারনা করেছেন, আমি ও রবীন্দ্রসাহিত্যকে সপ্রমাণ করার উদ্দেশ্যে প্রাচীন সাহিত্য, মৌলিক শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি। তাতে কে উত্তমর্ণ, কে বা অধমর্ণ তা ঐতিহাসিকগণ বিচার করবেন। শাস্ত্রে আছে,

ন জচ্চা বসলো হোতি, ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মনো,

কম্মুনা বসলো হোতি, কম্মুনা হোতি ব্রাহ্মনো।

জন্মের দ্বারা কেহ চণ্ডাল হয় না, জন্মের দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। কর্মের দ্বারা চণ্ডাল হয়, কর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়। কর্ম প্রাণিগণকে হীন-উত্তম করে। কর্ম-ই মানুষকে স্বর্গ-ব্রহ্মত্বে নিয়ন্ত্রিত করে। কর্মই অবীচি মহা নরকে পতন ঘটায়। কর্ম দ্বারাই এ বিশ্ব প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রিত। আমরা যারা বৌদ্ধ বলে দাবী করি, আমরা হচ্ছি জন্মগত বৌদ্ধ। বৌদ্ধধর্মের নীতি আদর্শ আমাদের জীবনে কতটুকু প্রতিফলিত - তা সঠিক বুঝা যায় না। আমি মনে করি-রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বুদ্ধগতপ্রাণ, কর্ম-কৃতিত্বে প্রকৃত বৌদ্ধ। কবিগুরুর সাথে আমাদের যদি তুলনা করি, তুলনার যুক্তি হল-তিনি ছিলেন অতল অসীম মহাসমুদ্রবিশেষ আর পরবর্তীকালে রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে যারা নাড়াচাড়া করছি-আমরা হচ্ছি অতলান্ত গভীর সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে ভাসমান তরী।

কবিগুরুর মাহাত্ম্য ও ঐশ্বর্য যে কত মহৎ ও কত গভীর বৈচিত্র্যময় তা ভাষায় প্রকাশ করার সাধ্য আমার কোথায়? তাঁর মানবতাবোধ মানব-মহিমা, তাঁর প্রতিভা বিশ্বজনীন, সার্বজনীন, সার্বকালীন। তাই তিনি বিশ্ব কবি, বিশ্ববিখ্যাত। তাঁর সাহিত্যসাধনা সম্পর্কে আলোচনা গবেষণামূলক যাঁরা গ্রন্থাদি রচনা করেছেন, যাঁরা বিচার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁদের গ্রন্থ রাজির অল্প কয়েকটি আমি পড়াশুনা করেছি। আমি তাঁদের গ্রন্থ থেকে নিঃসঙ্কোচে উপাদান গ্রহণ করেছি। আমি তাঁদেরকে সকৃতজ্ঞ চিত্তে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি তাঁদের নিকট সর্বতোভাবে ঋণী। আমার এই ঋণ অপরিশোধ্য। কবিগুরুর ভাব ভাষা ব্যাখ্যা তত্ত্ব বিশ্লেষণ প্রয়োজন বশে পরিবর্তন পরিবর্দ্ধন না করে আমার পুস্তকে সন্নিবেশিত করেছি। গ্রন্থ পঞ্জী-সমূহের উপাদেয় উপাদান উপকরণ গ্রহণ করে "রবীন্দ্র সাহিত্যে বৌদ্ধ সংস্কৃতি" পুস্তকটা মূল্যায়িত ও সমৃদ্ধ করেছি। বস্তুত তাতে আমার কৃতিত্ব কিছু নেই। শুধু আমি রবীন্দ্রসাহিত্যে বৌদ্ধ শিক্ষা সংস্কৃতি, নীতি আদর্শ কোথায় কিরূপে সন্নিবেশিত আছে, তা যথাসাধ্য নির্দ্দেশ করার চেষ্টা করেছি। তা-ও কতদূর সঠিক হয়েছে-সুধী সজ্জন বিচার করবেন। আমার কোন লেখা যদি অযৌক্তিক অবান্তর বলে বিচেচনা করেন, তাতেও আমার অসন্তোষ থাকবে না।

রাঙ্গুনিয়া নজরেরটিলা নিবাসী বাবু অরবিন্দ বড়ুয়া মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান সঞ্জয় কুমার বড়ুয়ার সাথে ১৯৯৬ সনের জুন মাসে কোরিয়ায় আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি আমার প্রতি অচলা ভক্তি প্রদর্শন করেন এবং আমার একটা বইর মুদ্রণ খরচ বহন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। সেই প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমান সঞ্জয়ের পিতা অরবিন্দ বাবু এই "রবীন্দ্র সাহিত্যে বৌদ্ধ সংস্কৃতি পুস্তক মুদ্রণের যাবতীয় ব্যয় ভার বহন করেছেন। তাঁদের এই ব্যয়ভার সমাজ ও জাতীয় জীবনের হিত সাধন, ধর্মবোধ উন্মোচনের সহায়তা করবে-তাতে সন্দেহ নেই। বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সঙ্ঘের চট্টগ্রাম আঞ্চলিক শাখার সভাপতি, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বাবু বিমলেন্দু বড়ুয়া এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ডিন্ জনাব ডঃ মনিরুজ্জামান সাহেব পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আদ্য-পান্ত পাঠ করে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদানে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। ডঃ মনিরুজ্জামান সাহেব ১৯৯১ সনে আমার প্রকাশিত বাংলা ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্য চর্যাপদের জ্ঞানগর্ভ সমালোচনা পূর্বকোন পত্রিকায় প্রকাশ করে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। কাতালগঞ্জ নবপণ্ডিত বিহারের আবাসিক ভিক্ষু আয়ুষ্মান নন্দবংশ আমার এই গ্রন্থরচনা কর্মে অর্থব্যয়, সৌজন্যপ্রদর্শন, বিবিধ প্রকারে যোগাযোগ করে সহযোগিতা করেছেন। তদ্ধেতু তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনৌজ্জল্য প্রার্থনা করি। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন শিল্পী শ্রী আশীষ চৌধুরী"। মুদ্রণ পারিপাট্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য ও গ্রন্থের মান উন্নয়ন কল্পে বিশেষভাবে প্রযত্ন নিয়েছেন অন্তিকা প্রেসের মালিক শ্রীযুক্ত বাবু সত্য প্রসন্ন বড়ুয়া ও তাঁর সন্তান। তাঁরা মুদ্রণকর্ম ত্বরান্বিত ও সুশোভিত করার লক্ষ্যে খুব পরিশ্রম করেছেন। তজ্জন্য আমি তাঁদের প্রতি ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। চন্দনাইশ থানার অন্তর্গত গাছবাড়িয়া সরকারী মহাবিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক বাংলা বিভাগীয় প্রধান শ্রীযুক্ত বাবু বাদল বরণ বড়ুয়া মহোদয় "রবীন্দ্র সাহিত্যে বৌদ্ধ সংস্কৃতি" গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন, প্রুফ সংশোধন করে দিয়েছেন এবং মুদ্রণ কর্মেও প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করেছেন। তদ্ধেতু আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

এই পুস্তক রচনা ও সঙ্কলন দ্বারা যদি সমাজের কিঞ্চিৎ মাত্র উপকার সাধিত হয়, তাহলে আমার পরিশ্রম ও প্রকাশকের অর্থব্যয় সার্থক মনে করব।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের
অধ্যক্ষ,
বিশ্ব শান্তি প্যাগোডা।

বৈশাখী পূর্ণিমা-
তাং ১০-১০-২৫৪০ বুদ্ধাব্দ
২১-৫-১৯৯৭ ইং
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম,
বাংলাদেশ

সূচীপত্র

রবীন্দ্রসাহিত্যে বৌদ্ধসংস্কৃতি

সত্য কথা বলতে কি দু'শ বছর পূর্বেও প্রাচীন ভারতবর্ষের হিমালয় অঞ্চলের কিছু সংখ্যক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্ব ক্ষুদ্র অঞ্চলের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে পূজাঅর্চনার তন্ত্র-মন্ত্র ইত্যাদি ছাড়া তৎকালীন বৌদ্ধদের ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সাধন-ভজনের আর কোন পরিচয় ছিল না। বিদেশী শাসকের অক্টোপাসের অত্যাচারে, সাম্প্রদায়িক আক্রমণে, বিদেশী বীর শক্ হূন প্রভৃতি যাযাবর জাতির ধনলুব্ধ দৃষ্টিতে, কালের করাল গ্রাসে বুদ্ধবিদ্বেষী লোকের বিষাক্ত ছোবলে আক্রান্ত হয়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব, প্রতিপত্তি প্রায়শঃ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এহেন সংকটকালে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ভারতীয়দের মধ্যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে ও শিক্ষিত সমাজে বৌদ্ধ ধর্মদর্শনের অনুসন্ধান, লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার এবং পঠন পাঠন আরম্ভ হয়েছিল। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার ব্রাহ্ম মতাবলম্বী। তথাপি তিনি লক্ষ্য করেছিলেন সনাতন ধর্মের যাগ যজ্ঞ, আচার অনুষ্ঠান সর্বস্বতা এবং পৌত্তলিকতা; ভারতীয় গণজীবনে খৃষ্টান ধর্মের প্রভাব বিস্তার লাভ; বিশেষতঃ মুষ্টিমেয় বাংগালী বৌদ্ধদের বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ঘটছে। মহর্ষিদেব আরো লক্ষ্য করলেন ব্রাহ্ম ধর্মের সাথে বৌদ্ধধর্মের নীতিআদর্শের অনেক বিষয়ে সামঞ্জস্য বর্তমান। বৌদ্ধধর্মের যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তখন স্বভাবতঃই তিনি বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনে গভীর জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে প্রয়াসী হয়ে উঠলেন। তদ্ধেতু বৌদ্ধধর্মের পীঠস্থান শ্রীলংকায় যাত্রার জন্য মনে প্রাণে প্রস্তুত হলেন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর মহর্ষিদেব বৌদ্ধ রাষ্ট্র শ্রীলংকায় গমন করলেন। তাঁর সংগে ছিলেন সেই যুগের অসাধারণ প্রতিভাশালী যুবক কেশব চন্দ্র সেন, কালী কমল গাংগুলী এবং তাঁর পুত্র সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর। বহুদিন শ্রীলংকায় অবস্থানের ফলে তাঁদের বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের সাথে পরিচয় ঘটল। সেখানকার বৌদ্ধদের ধর্মনিষ্ঠা, উপাসক উপাসিকাদের সম্মিলিত প্রার্থনা, ভিক্ষু সংঘের ধ্যান ধারণা, উচ্চাংগের জীবন চর্চা, সুগভীর রীতিনীতি, সাধন ভজন তাঁদেরকে মুগ্ধ ও প্রভাবান্বিত করল। মহর্ষিদেব দেখলেন ব্রাহ্মধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে অনেক অনেক সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান। তাঁর অন্তরে একটা গভীর আক্ষেপের সৃষ্টি হল যে এই বৌদ্ধধর্ম তো ভারতেরই ধর্ম। ভারত আজ বৌদ্ধধর্মের অমৃত রসবোধ হারাতে বসেছে। এই যাত্রায় মহর্ষিদেবের শ্রীলংকায় আগমনের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল; ভারতে লুপ্তপ্রায় প্রাচীন ধর্ম সংস্কৃতি পুনরুদ্ধার এবং বৌদ্ধ ধর্মের সাথে ব্রাহ্মধর্মের তুলনামূলক গবেষণা করে ব্রাহ্মধর্মের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন। তাঁর দৃষ্টিতে বৌদ্ধ ধর্মের যুক্তি মনন ও ব্রাহ্মধর্মের যুক্তিমননের একটি সুগভীর সৌসাদৃশ্য ধরা পড়ে। শ্রীলংকায় অবস্থান কালেই বৌদ্ধ ধর্ম বিনয়ের বিধানানুসারে সুসংগঠিত ভিক্ষু সংঘের সুসংযত জীবন চর্যা লক্ষ্য করে স্থির করলেন যে বৌদ্ধ সংঘের মত ব্রাহ্মধর্মের পূর্ণ বিকাশের জন্য একটি সাংগঠনিক সংস্থা ও দৃঢ়তা অত্যাবশ্যক। শ্রীলংকায় বৌদ্ধসংঘ ও তাঁদের সংগঠনের চিত্র তাঁদের অন্তরে

জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। তাই বহুদিন পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন পূর্বক মহর্ষিদেবের উদ্যোগে কেশব সেন প্রভৃতি দেশের যুবকদের ধর্ম শিক্ষার জন্য তাঁরা ব্রাহ্ম বিদ্যালয় নামে একটি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানে মহর্ষিদেব ও কেশব সেন নিজেই শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এই বিদ্যালয়টি হল ব্রাহ্মধর্মের পরিপূর্ণ বিকাশ ও বৌদ্ধধর্মের পুনরুদ্ধারের প্রধান কেন্দ্র। ইহা উভয় ধর্মের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। স্বাভাবিক ভাবেই মূল উদ্দেশ্য সফল করার জন্য তাঁদের অন্তরে অনুসন্ধিৎসা জেগে উঠেছিল।

মহর্ষিদেবের শ্রীলংকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ঠাকুর পরিবারে বৌদ্ধ ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যের পঠন পাঠন বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে এবং বৌদ্ধ শিক্ষা সংস্কৃতি ও শাস্ত্র চর্চার একটা বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মহর্ষিদেবের পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার ফলশ্রুতি স্বরূপ "বোম্বাই চিত্র" গ্রন্থে শ্রীলঙ্কা ভ্রমণের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তাতে শ্রীলঙ্কায় বুদ্ধ শাসনের কেশব সেনের রচিত শ্রীলঙ্কা ভ্রমণ বৃত্তান্ত Diary of Ceylon নামক গ্রন্থ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্ম ট্রাষ্ট সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে সুদীর্ঘ দিনের পরিশ্রমে সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর লিখলেন 'বৌদ্ধ ধর্ম' নামক গ্রন্থ। সে গ্রন্থে শ্রীলঙ্কার যাবতীয় বর্ণনা বিশদরূপে বর্ণিত আছে। তা সুদীর্ঘ কালের কঠোর পরিশ্রমের ফলে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের মুখপত্রে গ্রন্থকার বলেছেন, "সিংহলেই সর্ব প্রথম বৌদ্ধ শাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল"। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকার সত্যেন্দ্র নাথ বলেছেন,-আজ আমরা প্রাচীন ভারত বর্ষের ইতিহাস বলতে প্রধানতঃ বৌদ্ধ যুগের ইতিহাসই বুঝি। আমরা আবিষ্কার করেছি যে বৌদ্ধ যুগ ছিল এদেশের সকল প্রকার শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ঐতিহ্যবাহী সর্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত স্বর্ণযুগ। তাই সম্রাট অশোক এবং তাঁর অমর কীর্তির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এই প্রতীতি জন্মে যে, আমাদের পূর্ব পুরুষগণ কিরূপ সুসভ্য জাতি ছিলেন। এ কথা কে বলতে পারে যে আমাদের সগোত্রীয় পূর্বসূরীবৃন্দ বৌদ্ধপন্থী ছিলেন না? বাংলাদেশ বৌদ্ধ ধর্মের একটি অগ্রগণ্য ধর্মক্ষেত্র তীর্থ-ভূমি ছিল। পন্ডিত মহলে অদ্যাবধি এই সিংহলী বৌদ্ধ ধর্মই স্বয়ং বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মরূপেই স্বীকৃত ও অনুমোদিত। সিংহলের মঠে মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত বৌদ্ধ ধর্মের আদি গ্রন্থগুলো সিংহলী ভাষায় নয়, পালি ভাষায় লিখিত।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বিবৃতি ও মন্তব্যের প্রকৃষ্ট প্রমান হচ্ছে-বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কৃতি সম্পর্কিত ছয়টি মহা সম্মেলনের মধ্যে চতুর্থ মহা সম্মেলন যা শ্রীলঙ্কায় খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে সিংহলরাজ বট্টগামিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই মহা সম্মেলনেই বিনয় সূত্র অভিধর্ম নামে ত্রিপিটক সর্ব প্রথম লিপিবদ্ধ হয়। এটাই এই মহা সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য। বৌদ্ধ ধর্ম নামক গ্রন্থে সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর আরো বলেছেনঃ "মহাযান বৌদ্ধধর্মের সাথে বর্তমান হিন্দু ধর্মকে উক্ত ধর্মের রূপান্তর বললেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের সম্যক জ্ঞান লাভ করলে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের ও জাতীয় মনের ইতিহাসের জ্ঞানও লাভ করতে সক্ষম হবো। আর তখন হয়তো আবিষ্কার করব যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের মৃত্যু হয়নি"।

সাধন প্রদীপ্ত মহর্ষিদেব শ্রীলঙ্কা থেকে ফিরে এসে যখন বৌদ্ধ ভাবধারায় পঠন-পাঠন শিক্ষা-সংস্কৃতি, অনুশীলন, অনুধাবনে নিমগ্ন, এমন সময় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মহর্ষিদেবের পুত্র রবীন্দ্র নাথের জন্ম। তখন থেকেই শিক্ষিত বাংগালী সমাজে মহর্ষিদেবকে কেন্দ্র করে, ঠাকুর পরিবারে বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের চর্চা অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। তিনি ছিলেন একাধারে গৃহী ও ভোগী, অন্যদিকে ত্যাগী সন্ন্যাসী। কাজেই রবীন্দ্রনাথ জীবনে উত্তরাধিকার সূত্র ও পিতৃ সংস্কাররূপে জন্ম লগ্ন থেকেই বৌদ্ধ ধর্মকে উপনিশ্রয় সম্পদ হিসাবে পেয়েছিলেন। যে পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জন্ম, সেই পরিবেশেই তাঁর বাল্য ও কৈশোর কাল অতিবাহিত। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ জন্মসূত্রে ও পিতৃসংস্কারে বৌদ্ধধর্মকে জীবনের ভিত্তিরূপে লাভ করেছিলেন-এ কথা বলা অযৌক্তিক নয়। বুদ্ধের ধর্ম যেমন সার্বজনীন, সার্বদেশিক, সার্বকালীন, বিশ্বজনীন, তেমনি রবীন্দ্র সাহিত্য, কাব্য-কবিত্ব সার্বজনীন, সার্বদেশিক, সার্বকালীন, বিশ্বজনীন। তাঁর ভাব ভাষায় অনুভূতিতে বিশ্বের সকল প্রাণীর জীবনের সমগ্র কর্মকান্ড জীবন্ত, পরিস্ফুট ও মহিমাময় হয়ে উঠেছে। তিনি নিজের জীবনে সমগ্র জগতকে এবং সমগ্র জগজ্জীবনের মধ্যে নিজকে অনুভব করে কাব্য-কবিত্বের মাধ্যমে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবিরূপে বিশ্ববিশ্রুত।

কেশব সেন যখন গয়া থেকে ফিরে এলেন তখন সেখানকার বৌদ্ধদের ধ্যান ধারণা, রীতিনিয়ম, নীতি আদর্শ অনেকাংশে ব্রাহ্ম সমাজে গৃহীত হল। তিন মাস পর তাঁর প্রচেষ্টায় 'শাক্য সমাগম' নামে এক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়েছিল। এটা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এই অনুষ্ঠানে তাঁর সারগর্ভ বক্তৃতায় তথাগত বুদ্ধের অপার মহিমা তিনি এমনই মর্ম ব্যাকুলতার সাথে প্রকাশ করলেন তাতে বুদ্ধের প্রতি শ্রোতাদের গভীর শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয়েছিল। জানি না তা কতদূর সত্য। কেশব চন্দ্র সেন নাকি বর্তমান যুগে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সার্বজনীনরূপে তথাগত বুদ্ধের জন্মোৎসব পালনের রীতি প্রবর্তন করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় নব বিধান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বৌদ্ধ ভাবধারার বিস্তার লাভ ঘটতে থাকে। তাঁরই অনুরোধে নব বিধানের সাহিত্য মালার প্রথম "শাক্য মুনি চরিত ও নির্বাণ তত্ত্ব" লিখলেন অঘোর নাথ। কেশব চন্দ্র সেনের ছোট ভাই কৃষ্ণ বিহারী সেন "বুদ্ধ চরিত ও অশোক চরিত' গ্রন্থ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে প্রণয়ন করেন। বুদ্ধচরিত গ্রন্থ ঠাকুর পরিবার থেকে প্রকাশিত হয়। ঠাকুর পরিবার থেকে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুরের আর্য ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাত নামক গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। একই সাথে দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর 'নানা চিন্তা' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন যাতে বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ক আলোচনায় পূর্ণ ছিল। এরূপে ঠাকুর পরিবার বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য চর্চার প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। পরবর্তী কালে রবীন্দ্র নাথ যখন কাব্য কবিতা জগতে আবির্ভূত হলেন, যখন তিনি সাহিত্য ও ভাষা তত্ত্বের সাধনা আরম্ভ করলেন, তখন ঠাকুর পরিবার ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো একেকটি বৌদ্ধ সাহিত্য, ধর্মের ভাব ও মর্ম বাহক ভাষা, নাটক, উপন্যাস রবীন্দ্র মানস ক্ষেত্রে প্রচার প্রতিষ্ঠার বীজ বপন করা হল। তার ফলশ্রুতি স্বরূপ ঠাকুর পরিবার ও শান্তি নিকেতন থেকে শতাধিক

রচনা প্রকাশিত হল। তাতে কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথের বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কৃতির প্রতি, তথাগত বুদ্ধের প্রতি, বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘের প্রতি অতলান্ত গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও মজ্জাগত স্বরূপ প্রকাশিত হল। এজন্য বৌদ্ধ ধর্ম সাহিত্যের প্রতিপাদ্য একই বিষয়বস্তু তাঁর রচনায় বারবার এসেছে। একই প্রতিপাদ্য বিষয়, এক জাতীয় ঘটনা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গও অভিন্ন। কখনও গীতিনাট্য, কখনও কাব্য-কবিতা, কখনও নাটক, কখনও ইতিহাস, কখনও প্রবন্ধাকারে বিভিন্ন কালে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে এই প্রতীতি জাগা খুবই স্বাভাবিক যে, মানুষ যখন রচিত বিষয়টি হতে বিস্মৃতির অতল দেশে নিমজ্জিত হয়ে যায়, লোক শিক্ষার মানসে পুনর্জাগরণের জন্য এক বিষয় বিভিন্ন ভংগিমাতে পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করেন। কিন্তু আমি মনে করি বৌদ্ধধর্মের আদর্শ নীতি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পিতৃসংস্কারপুঞ্জ কবি গুরুর মজ্জাগত সংস্কাররূপে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সেগুলো তাঁর চিত্ত প্রবাহে প্রচ্ছন্ন শক্তিরূপে সর্বক্ষণ প্রবাহিত হয়ে চলছিল। কিছুতেই তা তিনি বিস্মৃত হতে পারতেন না। বিশ্বপ্রেম বিশ্বমৈত্রী মহাকরুণা কবিগুরুকে সর্বদা উদ্ভাসিত উদ্দীপিত করেছে। তদ্ধেতু এক কথাকে বহু বছরের ব্যবধানে এসেও একেকবার, একেক আখ্যায় রচনা করেছেন। যেমন-কুশ জাতকের উপাদান গ্রহণপূর্বক কুশ রাজার জীবন বৃত্তান্ত অবলম্বনে ১০/১২ বছর পর পর তিনবার লিখলেন-প্রথমে 'রাজা' মাঝে 'অরূপরতন' ও পরে 'শাপ মোচন' নাটক, নাটিকা গীতি নাট্য কাহিনী। একেক সময় একেক নাম করণের মধ্যেও সবিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। সাথে সাথে তাঁর সুবিশাল সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে বৌদ্ধ জীবনাদর্শ অনুসৃত হয়ে তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক বোধের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির ইতিহাস, বৌদ্ধ যুগের একটি গৌরবময় অধ্যায় উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়েছে। তাতে বৌদ্ধ সাহিত্যের উপকরণ গুলোর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৌদ্ধ সাহিত্য সংস্কৃতি, নীতি আদর্শ অবলম্বনে জীবনে যতগুলো কাব্য, কবিতা, নিবন্ধ, নাটক, কথিকা, ইতিহাস ইত্যাদি রচনা করে গিয়েছিলেন, তন্মধ্যে কোন্‌টির মধ্যে বৌদ্ধ দর্শনের কিরূপ তত্ত্ব-তথ্য আরোপ করেছেন তা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তিনি স্থবিরবাদ পন্থী পালি সাহিত্য, শাস্ত্র কাহিনী ও পরবর্তীকালে পালি শাস্ত্র হতে ভাষান্তরিত বৌদ্ধ সংস্কৃত শাস্ত্র অবদান শতক কাহিনীনিচয়-এই উভয় ক্ষেত্রের উপাদান সংগ্রহ করে রচনা কার্য সম্পাদন করেছেন। তবে প্রত্যেকটি রচনা অতি সংক্ষিপ্ত। এগুলোর সঠিক ও পরিপূর্ণ ঘটনা অবগত হতে হলে মূল সাহিত্যের বিষয়বস্তুর পটভূমিকা জানা থাকা একান্ত কর্তব্য। কবিগুরুর প্রত্যেকটি রচনা আলোচনা গবেষণা সাপেক্ষ। সেজন্য অভিজ্ঞ কৃতবিদ নিপুণ আদর্শনিষ্ঠ আচার্যের প্রয়োজন। নচেৎ পরিষ্কার বোধগম্যে আসবে না।

পালি সাহিত্যের কুশ জাতক ও বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ মহাবস্তু অবদান হতে উপাদান গ্রহণ করে তিন দশক সময় কালের মধ্যে তিনি গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করলেও এগুলোর প্রতিপাদ্য বিষয়, ব্যক্তিবর্গ প্রায়শঃ এক ও অভিন্ন তবে সামান্য বৈসাদৃশ্য আছে মাত্র। পূর্ণাঙ্গ লিপিবদ্ধ করলে প্রত্যেকটি বিরাট বিস্তৃত আকার ধারণ করবে। কাজেই অতি সংক্ষেপে তা দুধরার চেষ্টা করব।

কুশরাজ

কুশ জাতকের কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ-

মল্লরাজ ইক্ষ্বাকুর অগ্রমহিষীর নাম ছিল শীলবতী। যথাকালে তাঁদের দুই পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। এক জনের নাম কুশ কুমার। তিনি ছিলেন পরম জ্ঞানী, তীক্ষ্ণ প্রতিভা-সম্পন্ন, কিন্তু কুৎসিত কদাকার, বিশ্রী, রাক্ষস আকৃতিবিশিষ্ট। দ্বিতীয় পুত্র জয়ম্পতি ছিলেন অত্যন্ত রূপবান, সুশ্রী, অনিন্দ্য সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট। কিন্তু নির্বোধ, বোকা। দেবরাজ ইন্দ্র শীলবতীকে কতেক দ্রব্য উপহার দিলেন। তম্মধ্যে কোকনাদ বীণা অন্যতম। কুশ কুমার ছিলেন বোধিসত্ত্ব। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পিতা তাঁকে রাজপদে অভিষিক্ত করবার এবং বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। রাজ কর্মচারীগণ দেশে দেশে ভ্রমণ করে মদ্র রাজকন্যা প্রভাবতীকে যোগ্যা পাত্রীরূপে নির্বাচন করলেন। কুৎসিত কদাকার কুশ কুমারের সাথে পরমা সুন্দরী সুদর্শনা প্রভাবতীর বিবাহ কার্য সমাধা হল। সাথে সাথে কুশ কুমার সিংহাসনে আরোহণ করলেন এবং অগ্রমহিষী পদে অভিষিক্ত হলেন প্রভাবতী। রাজমাতা শীলবতী আশঙ্কা বোধ করলেন-যদি আমার এমন পরমা সুন্দরী পুত্রবধু কুরূপ কুশ্রী পুত্র কুশ কুমারকে দেখতে পায়, হয়তো তাকে পরিত্যাগ করে বাপের বাড়ী চলে যাবে। সুতরাং তিনি একটি নিয়ম করে দিলেন যে, দিনের বেলায় কেউ কাকেও যেন দেখতে না পায়, রাত্রির অন্ধকারে গৃহে ঘটবে পুত্র ও পুত্রবধুর সম্মিলন। এভাবে কিছুদিন কাটল। অতঃপর প্রভাবতী কুশ কুমারকে দিবালোকে দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন রাজমাতা হস্তী মংগলোৎসবে হস্তী শালায় দুজনের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সেখানে রাণী রাজাকে চিনতে পারলেন না। এদিকে রাণী প্রভাবতী স্বামীকে দর্শন করার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। রাজমাতা এক বুদ্ধি করলেন-কনিষ্ট পুত্র রূপবান জয়ম্পতিকে রাজবেশে সজ্জিত এবং কুশ রাজকে হস্তী মাহুতের বেশ ধারণ করিয়ে এক হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়ে- পুত্রবধূকে দেখালেন। পুত্রবধূ প্রভাবতী সুসজ্জিত রাজাকে দেখে খুব খুশী হয়ে গেলেন। তথাপি প্রভাবতীর অন্তরে আরেক চিন্তার উদ্রেক হল যে, এহেন অসুন্দর কুশ্রী ব্যক্তিকে কেন হস্তীর পৃষ্ঠে রাজার সাথে স্থান দিল। রাণীর অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক হল। সর্বক্ষণ সন্দেহের দোলনে দুলছে। অবশেষে একদিন রাজার উদ্যানে পুষ্করিণীতে জলক্রিয়া কালে প্রভাবতী পদ্ম-পত্রের আবরণ উন্মুক্ত করে উঠে আসতে রাক্ষসবেশী এক ব্যক্তিকে দেখে ভয়ে ভীতা হয়ে গেলেন। সহচরীদের নিকট পরিচয়ে জানতে পারলেন যে ইনিই সেই কুশরাজ। এখন শাশুড়ী মাতার সব কারসাজি তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। অতঃপর রাণী প্রভাবতী এরূপ কুশ্রী কদাকার স্বামীকে নিয়ে কি করে সংসার জীবন যাপন করবেন? শেষ পর্যন্ত চলে গেলেন পিত্রালয়ে। কুশরাজ রাণীকে বাধা দিলেন না। যথাকালে বাধা না দিলেও বিরহ-বেদনায় কুশরাজ স্থির থাকতে পারলেন না। শক্র প্রদত্ত কোকনাদ বীণাটি হাতে নিয়ে প্রভাবতীর পিত্রালয়ে শাকল নগরে ছদ্মবেশে আশ্রয় নিলেন। বীণার সুরটি ছিল প্রভাবতীর কাছে একান্ত পরিচিত।

কুশরাজ যে পত্নীর সাক্ষাৎ পাওয়ার মানসে শাকল নগরের রাজধানীতে পৌঁছেছেন, তা প্রভাবতীর বুঝবার বাকী রইল না।

চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে মদ্র রাজার রূপবতী কন্যা প্রভাবতী রাজ্যত্যাগিনী, স্বামী বর্জনকারিনী হয়ে বাপের বাড়ীতে চলে এসেছেন। এমন সময় দেশের সাতজন রাজা মোহাসক্ত চিত্তে প্রভাবতীকে লাভ করার উদ্দেশ্যে মদ্ররাজ্য আক্রমণ করল। মদ্ররাজ কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে সিদ্ধান্ত করলেন যে প্রভাবতীকে সাতজন রাজার হস্তে সমর্পন করবেন। এতে রাজপুরীতে শোকছায়া নেমে এলো। মদ্র রাজমহিষী তখন কন্যার জন্য ক্রন্দন করতে লাগলেন। মদ্ররাজা জামাতা কুশ রাজের শক্তি সামর্থ্য ও গুণ-গরিমা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। রাজা বললেন,-আজ আমার জামাতা কুশরাজ এখানে উপস্থিত থাকলে এই সাতজন রাজাকে পরাস্ত করা অসম্ভব হতো না। এই মন্তব্য রাণীর কর্ণ-গোচর হল। তখন প্রভাবতী মহা বিপদের আশংকা ও কলংক ভয়ে কাতর হয়ে মা বাবাকে জানালেন, তোমাদের জামাতা কুশরাজ এখানে উপস্থিত আছেন। মদ্ররাজ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হয়ে কুশরাজ সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁর শরণাপন্ন হলেন এবং অনুগ্রহ ভিক্ষা করলেন। প্রভাবতীও কুশরাজের পদপ্রান্তে পতিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। রাত্রি অন্ধকারের রাজা পরিত্যক্ত কুশরাজ চরম দুঃসময়ে হয়ে গেলেন আজ ত্রাণকর্তা।

কুশরাজ বীরদর্পে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে অনেক কৌশল প্রয়োগ পূর্বক সাতজন রাজাকে পরাস্ত ও বন্দী করলেন। পরিশেষে দেবরাজ ইন্দ্রের বিরোচন মনির প্রভাবে এবং পূর্ব জন্মার্জিত অকুশল ও কুশল কর্মের প্রভাবে ভাগ্য পরিবর্তন হলো। কুৎসিত কদাকার কুরূপ কুশরাজ সুশ্রী, সুরূপ স্বাকার হয়ে উঠলেন। তখন রাজা রাণী উভয়েই সমতুল্য রূপ ধারণ করার ফলে উভয়ের মাঝে যে বিভ্রান্তি ও ভেদবুদ্ধি ছিল তা চিরতরে সাম্য হয়ে গেল। পূর্ব জন্মার্জিত কুশলাকুশল কর্মের তাৎপর্য ছিল নিম্নরূপঃ-

পুরাকালে বারানসী নগরস্থ এক গৃহে বোধিসত্ত্ব জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। একদিন বোধিসত্ত্বের বাড়ীতে অতিশয় রসযুক্ত পিঠা তৈয়ার করা হয়েছিল। এমন সময় একজন প্রত্যেক বুদ্ধ ঐ বাড়ীতে পাত্র হস্তে ভিক্ষার জন্য আসলে বোধিসত্ত্বের ভ্রাতৃ-বধু বোধিসত্ত্বের জন্য রক্ষিত পিষ্টকগুলো প্রত্যেক বুদ্ধকে ভিক্ষা দিলেন। হঠাৎ বন থেকে ফিরে এসে বোধিসত্ত্ব দেখলেন যে, তাঁর জন্য রক্ষিত পিষ্টকগুলো প্রত্যেক বুদ্ধকে দান করে ফেলেছে। বোধিসত্ত্ব ক্ষোভে দুঃখে ক্রোধান্বিত হয়ে প্রত্যেক বুদ্ধের পাত্র হতে কেড়ে এনে পিষ্টকগুলো খেয়ে ফেললেন। পর মুহূর্তে বোধিসত্ত্ব নিজের অন্যায় অপরাধ উপলব্ধি করে অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং নিজের জন্য রক্ষিত মায়ের গৃহে সদ্যোজাত চম্পক পুষ্প বর্ণাভ ঘৃত এনে অতীব শ্রদ্ধা চিত্তে প্রত্যেক বুদ্ধের পাত্র পূর্ণ করে দান করলেন। ক্রোধ চিত্তে পিষ্টক কেড়ে খাওয়ার ফলে কুশরাজ পরজন্মে কুৎসিত কদাকার হয়ে জন্ম পরিগ্রহ করলেন আর শ্রদ্ধা চিত্তে ঘৃত দান করার ফলে সেই জন্মেই কুশ্রী কুরূপ কুশরাজ সুশ্রী সুরূপে পরিবর্তিত হয়ে গেলেন।

রাজা, অরূপ রতন ও শাপমোচন-এই তিন গ্রন্থের ভাব, ভাষা ও বিষয়বস্তু মোটামুটি

এক হলেও গঠনগত, চরিত্রগত ও গুণগত কিছু কিছু তারতম্য আছে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রাজা একটা আংগিক সমৃদ্ধ রূপক নাটক। এই নাটকের অভিনয়যোগ্য রূপ নিয়ে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় অরূপরতন। অতঃপর গীতিনাটিকা হিসাবে শাপমোচন ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে রচনা করেন। বিষয়বস্তুতে ঐক্য থাকা সত্ত্বেও তিনটি গ্রন্থের নাটকীয় রীতিতে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এতে কবির অন্তরমুখী ভাব ক্রমশঃ গভীর হতে গভীরতর হয়ে এসেছে। তিন দশকে তিন ভাগে অরূপের মধ্যে গুণ মাহাত্ম্যের সন্ধান পেলেন। কবিগুরু বৌদ্ধ সাহিত্যের বিশ্বজনীন নীতি আদর্শ নাটকের মাধ্যমে প্রকাশ করে গিয়েছেন।

মোহমলিন এ বিশ্ব। বিশ্বের দৈহিক রূপ, বাহ্যিক রূপ ক্ষণিক, অনিত্য, অশুচি, দুর্গন্ধময়। রাণী প্রভাবতীর নিকট রূপজ আসক্তির তাড়নায় কুশরাজ হলেন ঘৃনিত। মল্লরাজ্য হল তুচ্ছ। রাণীর অন্তর্মুখী তাড়নায় অগ্রমহিষী পদ হল পরিত্যক্ত। রানীকে নিয়ে গেল বাপের বাড়ী। মোহজনিত ভাবই রাণীর অন্তরে মোক্ষম্। জগতের অন্য সব গৌণ ব্যর্থ হয়ে গেল। বাহ্য দৃষ্টিই প্রবল। মানুষের ভিতরের তথতা, নৈতিক জ্ঞান, চরিত্র সম্পদ যে মানুষের জীবনে প্রকৃত সম্পদ তার প্রতি রাণীর দৃষ্টি পড়লনা। রাণীকে কবি বিশ্বের প্রতিচ্ছবি, প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করলেন। রূপজ মোহের তাড়না এ বিশ্বে কার নেই। সকল জীবের অন্তর রূপজ মোহে আচ্ছন্ন। যাকে বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দে বলা যায়-" কায়গত মিথ্যা দৃষ্টি"। নিঃসার বস্তুর নিরর্থক খেলায় এ বিশ্ব মশগুল। এই মোহই সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ডকে আমেরিকান মহিলা সিমসনের প্রতি আসক্ত করে বৃটিশ সিংহাসনচ্যুত করেছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্য তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। রূপকায় ছাড়া রূপকায়ের একদিনও চলে না। এ ক্ষেত্রে জ্ঞাতব্য বিষয় হল যে, মানুষের মন যখন বাহ্য-দৃষ্টিতে রূপজ মোহে অন্ধ হয়ে যায়, তখন মন আর কিছু দেখতে পায় না। হৃদয় ভালমন্দ উপলব্ধি করতে পারে না।

কবিগুরু এক গীতি কবিতায় বলেছেনঃ-

বাসনার বশে মন অভিরত,
ধায় দশ দিসে পাগলের মত।

মোহের তাড়নায় তখন মন এত চঞ্চল হয়ে উঠে, জগতে একাকার অন্ধকার ছাড়া আর অন্যকিছু দেখতে পায় না। জীবনে সহস্র বিভ্রান্তি নেমে আসায় দিগ্বিদিক হুঁশ থাকে না। হিতাহিত বোধ হারিয়ে ফেলে। লভ্য বস্তুর প্রাপ্তিতে বাধা পড়লেই মানুষ ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলে, সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়, বিষপানে আত্মহত্যা করে, খুন খারাবি করে, আরো কতই না দুষ্কর্ম সম্পাদনপূর্বক জগতের সর্বাধিক প্রিয় আপনাকে মৃত্যুর সর্বগ্রাসী কবলে কবলিত করতে দ্বিধাবোধ করে না। আর যখন সকল বিভ্রান্তিকে নিরসন করে চিত্তপ্রবৃত্তি অন্তরমুখী হযে জ্ঞান চক্ষু উন্মুলিত হয়, তখন তাঁর জীবনে পরম প্রাপ্তির সিংহদ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়।

রাজর্ষিঃ বিসর্জন

প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্যবাহী ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ রাজবংশের নাম ছিল চন্দ্রবংশ। কুমিল্লা অঞ্চলে লালমাই ময়নামতী অনুচ্চ শৈল শ্রেণীর প্রাচীন নাম ছিল দেব পর্বত। তন্মধ্যে ক্ষীরদা নাম্নী ছোট একটি নদীর তীরে বজ্রযানী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজাদের রাজধানী ছিল। রাজ পরম্পরা এই লালমাই ময়নামতী থেকে দেশে শাসন-দন্ড পরিচালনা করতেন। রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তাঁরা লালমাই ময়নামতী অঞ্চল ত্যাগ করে পূর্ব পার্শ্বে উদয়পুর পাহাড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাঁদের রাজত্বকাল ছিল খৃষ্টীয় অষ্টম থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত। ১৫০১ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার মহারাজ ধন্য মানিক্য স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে চট্টগ্রাম আক্রমন করেন এবং মগধেশ্বরী মহাযান পন্থী বৌদ্ধ দেবতাকে উদয়পুরে এনে ত্রিপুরাসুন্দরী নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। ত্রিপুরার রাজ বংশের ইতিহাস রাজমালায় এরূপ কবিতায় উদ্ধৃতি দেখতে পাওয়া যায়ঃ-

চট্টগ্রাম সদরঘাট এক বৃক্ষমূলে
পূজয়ে আমাকে সদা মগধ সকলে
সেই স্থান হতে শীঘ্র আনহ আমায়।

ত্রিপুরার রাজারা তখনও তান্ত্রিক বৌদ্ধ ছিলেন। আমরা ছোটকালে লক্ষ্য করেছি- কুমিল্লা জেলার প্রায় বৌদ্ধ গ্রামে মগধেশ্বরী নাম্নী তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবতার পীঠস্থানরূপে সেবাখোলা ছিল। বৌদ্ধেরা সেখানে মধ্যে মধ্যে পূজা দিত। হিন্দু মুসলমানগণও এই পূজার আয়োজন পূর্বক খরচপত্র বহন করলেও পূজারী ছিলেন বৌদ্ধরা। বর্তমান যুগে বাংলার বৌদ্ধ সমাজে মগধেশ্বরীর পূজার প্রতি বড় একটা স্পৃহা না থাকলেও কোন কোন অঞ্চলে হিন্দুরা খোলা জায়গায়, এমনকি মঠ মন্দির নির্মাণ করে মগধেশ্বরী কালী নামে মূর্তি প্রতিষ্ঠা পূর্বক পূজা অর্চনা করে থাকেন। আমরা প্রত্যক্ষ করেছি এই পূজায় আকাশ থেকে অসংখ্য শকুন নেমে এসে পূজার আসর ভর্ত্তি হয়ে যেত। যতক্ষণ যে কোন একটি শকুন পূজার নৈবেদ্যে ঠোকর না মারত, ততক্ষণ পূজা সফল হয়েছে বলে বিবেচিত হত না। যেই ঠোকর মারত অমনি সমস্ত শকুন পূজার বেদিকায় ঝাঁপিয়ে পড়ত। তখন পূজারী ও আয়োজনকারীদের আনন্দের অন্ত থাকত না। সকলের কাছে বিবেচিত হত যে, আজকার পূজা সার্বিক সার্থক সফল হয়েছে। আর লক্ষ্য করেছি যে, দর্শকবৃন্দ শকুনগুলিকে আদর করে কোলে ধারণ করত। এরাও কোন রূপ সংকোচ বা ভয় করত না। পূজার আয়োজনে সামান্য ব্যতিক্রম ঘটলে শকুনমন্ডলী ধারে কাছেও আসত না। মানুষ কল্পনা করত ইহা মগধেশ্বরী মায়েরই মহিমা। অবিভক্ত বাংলায় বাংলার বৌদ্ধরা দলে দলে উদয়পুর মায়ের বাড়ীতে ধর্ম-পুণ্যালাভের আকাঙ্ক্ষায় গমনাগমন করতেন। এখনও উদয়পুর মায়ের মহিমা স্মরণে বাংলার বৌদ্ধরা পাগল।

স্বাধীন ত্রিপুরায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি লুপ্ত প্রায়। ধর্মের প্রচার প্রতিষ্ঠা ছিল

না। ভিক্ষু সংঘের বড় অভাব। ধর্মান্তর ছাড়া তখন আর গত্যন্তর ছিল না। পরিশেষে ত্রিপুরার রাজবংশের অমর মানিক্যের পুত্র রাজধর মানিক্য (১৬১১-১৬২৩ সন) সর্বপ্রথম গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্ম ও তার প্রভাব প্রতিপত্তি ও প্রচারের অভাবে, ত্রিপুরার রাজবংশ বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করলেও বহু শতাব্দীর পুঞ্জীভূত ঐতিহ্য ও সংস্কার ত্যাগ করতে পারেননি। বর্তমান আগরতলা রাজপরম্পরা প্রাচীন চন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধ রাজাদের উত্তরসূরী। তার প্রমাণ মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর এবং আগরতলায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত কুঞ্জবনস্থ বেনুবন বিহার।

সেই চন্দ্রবংশীয় রাজপরম্পরার মধ্যে কল্যাণ মানিক্যের পুত্র গোবিন্দ মানিক্য ছিলেন একজন বিখ্যাত রাজা। এই বেনুবন বিহারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয় ১৯৪৪ সনে। বিহারের নির্মাণ কার্য সমাধা করতে পুরা দুই বছর সময় লেগেছিল। বিহারটি উদ্বোধন করা হয় ১৯৪৬ সনে বৈশাখী পূর্ণিমার মহান পবিত্র তিথিতে। এ অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী থেকে ৭০ জন বিশিষ্ট ভিক্ষু অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই উৎসব উপলক্ষে একটি ভিক্ষু-সীমা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এই দুই বছর সময়কালের মধ্যে আমি লাকসাম থেকে প্রায়ই আগরতলা যেতাম। তখন লাকসাম থেকে আগরতলা যাওয়া দুই ঘন্টার ব্যাপার। মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর আমাকে বিহার নির্মাণ কার্যের কিছু কিছু দায়িত্ব অর্পন করতেন। আমি আগরতলা গেলে শ্বেত মহলে অবস্থান করতাম। লাকসাম নানা কাজে ব্যস্ত ছিলাম বলে আগরতলা সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। বিহার উদ্বোধন কালে অনেকদিন একটানা উপস্থিত ছিলাম। উদ্বোধনী কার্যে যথাসাধ্য সহযোগিতা করেছি। ১৯৪৬ সনের পরে মাননীয় ভিক্ষু আর্যমিত্র সুদীর্ঘ কয়েক বছরের জন্য সিংহল গমন করেছিলেন। চট্টগ্রাম বাথুয়া বিহারাধ্যক্ষ পূজ্য ভিক্ষু শ্রীমৎ প্রিয়ানন্দ মহাস্থবির ও আমি ছিলাম বেনুবন বিহারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে। মাননীয় শ্রীমৎ প্রিয়ানন্দ মহাস্থবির বেশী ব্যবধানে ছিলেন বলে বেশী সময় দিতে পারতেন না। আমি অতি নিকটে ছিলাম বলে আগরতলা ঘনঘন যাতায়াত করতাম। ১৯৫৬ সনে মাননীয় ভিক্ষু আর্যমিত্র বিশ্ববৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের বার্ষিক সম্মেলনে নেপাল চলে যাওয়াতে বেনুবন বিহারে আমি বুদ্ধজয়ন্তী উৎসবের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেছি। এই অনুষ্ঠানের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন আগরতলা কলেজের অন্যতম অধ্যাপক শ্রী বেনী মাধব সেন। অনুষ্ঠানের পরিচালনায় ছিলেন বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য। ১৯৭১ সনে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বুদ্ধ পূর্ণিমা অনুষ্ঠানে আমি ছিলাম উদ্বোধনী ভাষণে। বাংলার বিখ্যাত মণীষী সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন প্রধান অতিথি এবং কুমিল্লার বিখ্যাত পন্ডিত শ্রী রাসমোহন চক্রবর্তী ছিলেন বিশেষ অতিথি। মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ হীরালাল চাটার্জী ছিলেন সভাপতি। পরদিন কেন্দ্রীয় কারাগারের অনুষ্ঠানে ডঃ হীরালাল চাটার্জী ছিলেন সভাপতি, আমি ছিলাম প্রধান বক্তা। আনুষ্ঠানিক কর্ম পরিচালনায় ছিলাম আমি। তাছাড়া সাধারণ উৎসব পার্বনে প্রায়ই বেনুবন বিহারের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। কেন্দ্রীয় কারাগারে, অভয়নগর মহিলা আশ্রমে, আতুরালয়ে বুদ্ধ পূজাদি অনুষ্ঠান বেনুবন বিহারের অংগানুষ্ঠান ছিল।

যে রাজবংশ শত শত বৎসরাবধি বৌদ্ধ, সে বংশে বৌদ্ধধর্ম সংস্কৃতি ঐতিহ্য, পুরুষ পরম্পরার মধ্যে বুদ্ধপ্রাণতা, সে বংশের মজ্জাগত সংস্কারে, রক্তের ক্রমধারার মধ্যে বৌদ্ধ চেতনা, কখনো অন্য মতাবলম্বী হলেও-ইতিহাস একেবারে মুছে ফেলা কারো সাধ্য নেই। সুতরাং ত্রিপুরার রাজাদের মধ্যে যে কেউ কেউ বুদ্ধ বা বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকবেন-তা নিতান্ত স্বাভাবিক।

মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্যের আমলে তিব্বতী বাবা নামে একজন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যের খবর পাওয়া যায়। তিব্বতী বাবা নামে পরিচিত হলেও তিনি তিব্বতের অধিবাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন বাংগালী। তাঁর একটা অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে প্রদান করা প্রয়োজন।

চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানার অন্তর্গত বৈদ্যপাড়া একটা ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধগ্রাম। বৈদ্যপাড়ার সম্ভ্রান্ত পরিবার ও গ্রামের নায়ক পুরুষ ছিলেন অভয় চরণ বড়ুয়া। অভয় চরণ বড়ুয়ার পঞ্চ পুত্র, যথা- লক্ষ্মী চরণ বড়ুয়া, কৃষ্ণ চরণ বড়ুয়া, দুর্গাচরণ বড়ুয়া, অন্নদাচরণ বড়ুয়া ও দেবীচরণ বড়ুয়া। এই অভয়চরণ বড়ুয়ার তৃতীয় ছেলে দুর্গাচরণ বড়ুয়া পরিণত বয়সে থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্মের নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশে ভিক্ষুত্ব বরণ করেছিলেন। তিনি নেপাল সিকিম, ভুটান প্রভৃতি দেশ সমূহ ভ্রমণ করতে করতে তিব্বতে গিয়ে পৌছেন। তিব্বতে বহু বছর অবস্থান করে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। অতঃপর ভারত তথা বাংলাদেশে এসে বর্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম ইত্যাদি অঞ্চল ভ্রমণ করতে থাকেন। সেই অঞ্চলের অসংখ্য মানুষ তাঁর মধ্যে যোগ-বিভূতি, তান্ত্রিক ধর্মের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়েছে। তখন থেকে তিনি বিখ্যাত সিদ্ধ পুরুষ, তিব্বতী বাবা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন। ভক্তরা তাঁকে পূর্বাঞ্চলে আসতে দিলেন না। বর্ধমান জেলায় তাঁর ভক্তগণ তিব্বতী বাবার জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। দিনদিন তাঁর শিষ্য সেবক ও ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমার জানামতে কলকাতা মহানগরীতে আজও তাঁর অগণিত অনুসারী বিদ্যমান। তাঁর খ্যাতি সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ল। কলকাতায় প্রত্যেক ভক্তের গৃহে তিব্বতী বাবার প্রতিকৃতি রক্ষিত ও পূজিত হয়ে আসছে। মেদিনীপুর নিবাসী কলকাতায় বসবাসকারী চাকুরীজীবী তিব্বতী বাবার ভক্ত ভূপেন্দ্র ভূষণ ভট্টাচার্য কর্তৃক লিখিত অনাম তটিনী নামে এক পুস্তক আমার কাছে আছে। আমি ভট্টাচার্য মহাশয়ের পরিবারের সাথে আজীবন বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। সেই পুস্তকে সন্নিবেশিত তিব্বতী বাবার ফটো আর তাঁর জন্মভূমি বৈদ্যপাড়া বাড়ীতে যৌবন কালের যে ফটো রক্ষিত আছে, তাতে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু যৌবন কালীন আর বৃদ্ধকালীন চেহারা। তিব্বতী বাবার যোগ-বিভূতির পরিচায়ক একটি গল্প এখানে প্রণিধানযোগ্য-

একবার তাঁর আত্মীয় স্বজন তাঁকে দেশে আনার উদ্দেশ্যে বর্ধমান গিয়েছিলেন। তিনি দেশে আসতে অনিচ্ছুক। তথাপি আপন জ্ঞাতি গোত্রের বিনীত অনুরোধে বর্ধমান আশ্রম থেকে দেশের দিকে অর্থাৎ চট্টগ্রাম অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন। গোয়ালন্দ থেকে নদীপথে

জাহাজ যোগে চাঁদপুর আসার সময় ঠিক মাঝামাঝি আসার পর তিনি হঠাৎ নদীগর্ভে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে গেলেন। জাহাজ থামল না। তাঁর খোঁজ নেবার সুযোগ রইল না। আত্মীয় পরিজনের বড় আপশোষ। দেশে আনতে গিয়ে তিব্বতী বাবাকে চিরতরে হারালাম। তিনি সলিল সমাধিতে নিমগ্ন হয়ে গেলেন। কিন্তু মাস খানেক পরে দেখা গেল-তিনি বর্ধমান আপন তপোবন আশ্রমে বহাল তবিয়তে হাজির। যথারীতি আহার বিহার করছেন।

আগরতলার চন্দ্রবংশীয় মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্য বাহাদুর, কি ক'রে জানি না, তিব্বতী বাবার জীবন মাহাত্ম্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। তিব্বতী বাবার লোকান্তর গমনের পর তাঁর সমাধিক্ষেত্র থেকে আনীত কিছু মাটি এবং অন্যান্য বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিদর্শন এনে শ্বেত মহলের সামনে একটি চৈত্য প্রতিষ্ঠা করে সেখানে তিব্বতী বাবার চিতা-মৃত্তিকা ও ভিক্ষুর নিদর্শন নিধান করতঃ প্রতিদিন জল-ফুল ইত্যাদি দ্বারা পূজা অর্চনার ব্যবস্থা করেছিলেন।

আগরতলার সন্নিকটে ইন্দ্রনগর পল্লীতে জমি চাষ করার সময় এক কৃষক একটি পাথরের মূর্তি পেয়েছিল। এই মূর্তিটি তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবতা বলেই সকলের ধারণা। মূর্তিটি রাজপ্রাসাদে রক্ষিত হয়েছিল।

বর্তমান ত্রিপুরার রাজবংশ যে ক্ষত্রিয় রাজবংশ, এ বংশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব যে বহু শত বছর পূর্বেকার, তাঁদের পূর্বপুরুষেরা যে লালমাই-ময়নামতীর দেবপর্বতে রাজত্ব করতেন-তার প্রমাণ পাওয়া যায়-রাজমালা গ্রন্থে-কৈলাস চন্দ্র সিংহ, ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন, ভবানী দাশ ও সুকুর মামুদ প্রভৃতি মণীষীবৃন্দের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বিচার ও বিবরণে।

এই মহারাজ গোবিন্দ মানিক্যের জীবন বৃত্তান্ত অবলম্বন করে কবিগুরু এক বিরাট উপন্যাস লিখলেন ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে। গোবিন্দ চন্দ্রের জীবন ও মাহাত্ম্য লক্ষ্য করেই উপন্যাসের নামকরণ করলেন রাজর্ষি। 'রাজর্ষি' উপন্যাস লেখার মূল উদ্দেশ্য হল ঋগ্বেদ, যজুর্বেদে, সোম যাগের গৃহীত বিধান যে- পশু বধ, জীবহিংসা এই সব যুক্তিহীন প্রথার উচ্ছেদ সাধন ও তামসিক আচার অনুষ্ঠানের বিরোধিতাপূর্বক তা চিরতরে নিরসন করা। অধিকন্তু মৈত্রী করুণা এবং তথাগত বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্ম "অহিংসা পরম ধর্ম" অর্থাৎ সর্বপ্রাণীর প্রতি মৈত্রী করুণা, প্রেমপ্রীতি, অকৃত্রিম ভালবাসার প্রচার প্রতিষ্ঠা করা। করুণাঘন বুদ্ধ বলেছেন-"যিনি শ্রদ্ধার যোগ্য পাত্র ও গরীব দুঃখীকে দান করেন, অপরের অভাব অনটন মোচন করেন, তিনিই প্রকৃত যজ্ঞ সম্পাদন করেন"। কবিগুরুর উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, হিংসা হত্যার বিরুদ্ধে বিপ্লব বিদ্রোহ ঘোষণা এবং মৈত্রী করুণার সিংহদ্বার উন্মোচন। কবিগুরুর লেখার মূল উদ্দেশ্য ছিল, জীববলির বিরুদ্ধে মৈত্রী মাহাত্ম্যকে বিজয়ী করা। পশুবলির বিরুদ্ধে প্রথম বিরোধিতা হচ্ছে রাজর্ষি উপন্যাস। তারই পূর্ণাংগ রূপ গৃহীত হয়েছে বিসর্জন নাটকে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে। দেবী মন্দিরে বলিদানে ঘোর বিরোধী ছিলেন মহারাজ গোবিন্দ মানিক্য। এই বিরোধিতার উৎস হল-গোবিন্দ মানিক্য তাঁর শিশুকন্যাকে নিয়ে একদিন ত্রিপুরা সুন্দরী কালী বাড়ীতে গিয়েছিলেন। কালী বাড়ীতে অজস্র পশুবলির রক্ত-স্রোত

গোমতী নদীতে প্রবাহিত হচ্ছে দেখে ভয় বিহবল চিত্তে শিশুকন্যা পিতাকে জিজ্ঞেস করলঃ- বাবা! এত রক্ত কেন ? পিতা গোবিন্দ মানিক্য জবাব দিলেনঃ এগুলো কালী বাড়ীর পশুবলির রক্ত। এতে শিশুকন্যা আতংকগ্রস্ত হয়ে গেল। কিছুদিন পর সেই শিশুকন্যা মৃত্যুমুখে পতিত হল। মৃত্যুর প্রাক্কালে শিশুকন্যার অন্তর প্রদেশে মরণ নিমিত্ত উপস্থিত হল- 'বাবা এত রক্ত কেন ? বাবা এত রক্ত কেন ?' তাতে স্নেহময় পিতা গভীর শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন। সেইদিন থেকে তাঁর অন্তরে পশুবলির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দানা বেঁধেছিল। রাজা গোবিন্দ মানিক্য দেব মন্দিরে বলিদানের ঘোর বিরোধী হয়ে উঠলেন। তাঁর সহযোগী ছিল মাত্র দুইজন লোক-জয়সিংহ ও অপর্ণা। অপরপক্ষে ছিলেন অশুভ প্রথার প্রতিভূ পুরোহিত ঠাকুর রঘুপতি, রাণী গুণবতী, রাজমাতা প্রজাবর্গ। তাঁরা জীব হিংসা হত্যাকে বিধির বিধান মনে করেন। একে অব্যাহত রাখার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিলেন। উভয়পক্ষে বহুকাল যাবৎ তুমুল যুদ্ধের মহড়া চলছিল। যেদিন রাজভ্রাতা নক্ষত্র রায়কে ভ্রাতৃহত্যায় প্ররোচিত করলেন রঘুপতি, সেদিন গুরুপিতার আচার ধর্মের প্রতি জয় সিংহের সংশয় জাগল। জয় সিংহ চিন্তা করলেন- এসব হিংসা হত্যা সত্যই দেবীর কাম্য কিনা ? তাই তিনি ক্ষুব্ধ চিত্তে দেবালয়ে গিয়ে প্রশ্ন রাখলেনঃ মা, এজন্যই কি জগতের সকলে তোমাকে মা বলে ডাকে ? তুমি জগতজননী, ভবতারিনী, গিরিনন্দিনী। সমগ্র সন্তানের রক্ত নির্গত করে নিজের উদর পূরণ করার জন্যই কি এই লোল জিহ্বা বের করে আছ ? স্নেহ মমতা প্রেম-প্রীতি, মৈত্রী করুণা সবই মিথ্যা? সত্যই কি কেবল অসংখ্য প্রাণীর অজস্র রক্তের প্রতি পিপাসা তোমার ধর্ম ? তোমার উদর পূরণের জন্য মানুষ মানুষের গলায় খড়গ বসাবে? ভাই ভাইকে খুন করবে ? পিতা-পুত্রে কাটাকাটি করবে? সত্যিই কি তুমি দেবী? বস্তুতঃ মনে হচ্ছে তোমার মধ্যে দেবত্ব মনুষ্যত্ব কিছু নেই। তুমি রাক্ষসী, তুমি পাষাণী, সন্তানের রক্তপান তোমার ধর্ম। জয় সিংহ উপলব্ধি করলেন এ বিশ্বের অন্তর্নিহিত সহজাত স্বভাব ধর্ম-প্রেম-প্রীতি, দয়ামায়া, ভক্তিশ্রদ্ধা মৈত্রী করুণা। এসব গুণাবলীর মধ্য দিয়ে সৌন্দর্য-মাধুর্যে মানুষ মানুষরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। হিংসা হত্যা বিরোধের মাধ্যমে নয়। জয়সিংহ সেদিন তাঁর সজীব প্রাণের কাছে যথার্থ সত্য বলে মনে করে অপর্ণাকে লক্ষ্য করে বললেন-

অপর্ণা এমন কিছু বল
ওই মধুকণ্ঠে তোর, ওই মধু আঁখি
রেখে মোর মুখ পানে, ঐ জনহীন
স্তব্ধ রজনীতে। এই বিশ্ব জগতের
নিদ্রা মাঝে, বলরে অপর্ণা, যা শুনিলে
মনে হবে চারিদিকে আর কিছু নাই,
শুধু ভালবাসা ভাসিতেছে, পূর্ণিমার
সুপ্ত রাত্রে রজনীগন্ধার গন্ধসম।

জীববলি রোধকল্পে দেবীমাতাকে লক্ষ্য করে জয়সিংহ প্রার্থনা স্থলে বলছিলেন- মা! সন্তানের রক্তপানই যখন তোমার ধর্ম-প্রার্থনা করি আমার রক্তদানই যেন শেষ রক্তদান হয়

এবং এই রক্তেই যেন রক্ত তৃষ্ণাতুর তোমার সমস্ত পিপাসা মিঠে যায়। এহেন রক্ত ক্ষয়ের যেন পুনরাবৃত্তি আর না ঘটে। এই বলে জয়সিংহ খরগোস জাতকে বর্ণিত খরগোসের ন্যায় নিজের প্রাণ দেবীর সম্মুখে বিসর্জন দিলেন। নিজের বক্ষে অসি মেরে আত্মবলি দিলেন। এই বিভীষিকাময় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজা গোবিন্দ মানিক্য চিরাচরিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে পশুবলির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন। রঘুপতির একমাত্র অবলম্বন ছিল জয়সিংহ। পালিত পুত্র জয়সিংহের আত্মবলি দানে রঘুপতির সকল অহংকার ভেংগে চুরমার হয়ে গেল। দেশে হাহাকার পড়ে গেল। জীবের প্রতি মৈত্রী করুণায় রঘুপতির অন্তর আপ্লুত হয়ে আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি উপলব্ধি করলেন- মন্দিরের প্রতিমাটি যতদিন মন্দিরে অধিষ্ঠিত থাকবে, ততদিন সমস্যার কোনরূপ সমাধান হবে না। পরিশেষে রঘুপতি মন্দিরের প্রতিমাটি গোমতী নদীর জলে বিসর্জন দিয়ে সকল সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করে মন্দির ছেড়ে চলে গেলেন।

কবিগুরুর রাজর্ষি উপন্যাস ও বিসর্জন নাটকের উপসংহারে নাটকীয় রূপে সবই বিসর্জনে পরিণতি লাভ করল। গোমতী নদীর স্রোতে দেবী প্রতিমার বিসর্জন, মহারাজ গোবিন্দ মানিক্যের স্বেচ্ছায় রাজ্য বিসর্জন, তাঁর নিষেধাজ্ঞায় যাগযজ্ঞ বিসর্জন, হিংসা হত্যা কুসংস্কারের প্রতিভূ রঘুপতির অন্তর হতে চিরাচরিত সহিংস নীতি বিসর্জন, হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী জয় সিংহের জীবন বিসর্জন, গোবিন্দ মানিক্য ও রানী গুণবতী-স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার অন্তর্দ্রোহের বিসর্জন, মহারানী গুণবতীর অন্তর হতে চিরতরে মিথ্যাদৃষ্টি বিসর্জন। তাই কবিগুরু নাটকের নামকরণ করলেন বিসর্জন। জয় অহিংসা পরম ধর্মের জয়। জয় সম্রাট অশোকের জয়, যিনি খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে ভারতবর্ষে পশুবলির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন। জয় মহারাজ গোবিন্দ মানিক্যের জয়।

পূজারিণীঃ নটীর পূজা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধযুগের পালিসাহিত্য ও পরবর্তী কালের অনূদিত সংস্কৃত গ্রন্থ অবদান শতক থেকে উপাদান গ্রহণ করে পূজারিণী কবিতা লিখলেন ১৯০০ খৃষ্টাব্দে। পঁচিশ বছর পর নটীর পূজা নাটক লিখলেন ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে। কবিতা ও নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এক ও অভিন্ন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, কবিগুরুর রচিত প্রতিটি কবিতা ও নাটকের পটভূমিকা জানা না থাকলে সংক্ষিপ্ত রচনা দ্বারা বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভবপর নয়। তাই এগুলোর পটভূমিকা জানা প্রয়োজন। এই রচনা দুটোর প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ ও তাৎপর্য নিম্নরূপঃ-

মগধরাজ বিম্বিসার বৈদিক ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করলেন। মহারাণী লোকেশ্বরীও স্বামীর অনুসরণ করলেন। বৌদ্ধ ধর্মের নীতি আদর্শ রাজা-রাণী উভয়কে

নির্লোভ, ক্ষমাশীল, বিষয় বাসনায় উদাসীন, অতলান্ত গভীর শ্রদ্ধায় আপ্লুত করে তুলল। মহারাজ বিম্বিসার যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর পুত্র অজাতশত্রু পিতৃরাজ্যের প্রতি লোলুপ হয়ে উঠেছেন, তিনি রাজ্য লাভে প্রয়াসী, তখন তিনি স্বেচ্ছায় পুত্রকে রাজ্য ছেড়ে দিলেন এবং রাজ্যের অন্যত্র এক প্রান্তে বাস করতে চলে গেলেন। অজাতশত্রু রাজ সিংহাসনে আরোহণ করে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিরোধ করার জন্য বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী দেবদত্তকে গুরু স্বীকার করে দেবদত্তের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। অধিকন্তু দেবদত্তের ষড়যন্ত্রে পিতাকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। মহারাজ বিম্বিসার অশোক তরুতলে যে বেদিকায় তথাগত বুদ্ধকে বসিয়ে বুদ্ধপূজা করতেন, ধর্ম দেশনা শ্রবণ করতেন, দেবদত্তের প্ররোচনায় সেই বেদিকা একেবারে ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। এদিকে মহারানী লোকেশ্বরী নানা কারণে দ্বিধাদ্বন্দ্বগ্রস্ত ও মনোক্ষুন্ন হয়ে পড়লেন। সিংহাসনে আরোহী পুত্র অজাতশত্রু দেবদত্তের ভক্ত। পুত্রবধু রত্নাবলী শিবপন্থী, কনিষ্ঠ পুত্র চিত্ত ভিক্ষুবেশ ধারণ পূর্বক অন্যত্র চলে গেছেন। স্বামী কারাগারে আবদ্ধ। সুতরাং মহারাণী ভীষণ মনোক্ষোভে দিন অতিবাহিত করছেন, তথাপি কোন রকমে সকলদিক রক্ষা করে চলছেন। আন্তরিকভাবে ত্রিরত্নের প্রতি অচলা ভক্তি ক্ষুন্ন করেননি। তাঁর জীবন আভ্যন্তরীন রূপে বুদ্ধ শাসনের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত। কিন্তু বাহ্যিক রূপে পুত্র ও পুত্রবধুর মন রক্ষার্থে শিব ঠাকুরের উদ্দেশ্যে বলতেন-নমঃ শ্রী বজ্র মহাকালায়। নমঃ পিনাক হস্তায়। রাজা অজাতশত্রুও বুদ্ধ ও দেবদত্তের শিষ্যদের উভয় দলকে সন্তুষ্ট রাখবার অসাধ্য সাধনে ব্যস্ত। উভয় পক্ষের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলছেন। ভাগ্যকে দুইদিক থেকেই নিরাপদে রাখতেন। কী জানি, কোন পক্ষের প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্ব প্রমানিত হলে পাছে কোনরূপ কোপে পতিত হন নাকি? ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসকগণ ঠিক যেমনি করে কখন হিন্দুকে হাতে রেখে মুসলমানের বিরুদ্ধে, কখন মুসলমানকে হাতে রেখে হিন্দুর বিরুদ্ধে উভয়পক্ষের সাথে তাল বাহানা করে নিজেদের কার্যউদ্ধার করার প্রয়াসী ছিলেন।

রাজবাড়ীর মধ্যে যখন এইরূপ দুই বিরুদ্ধভাবের দ্বন্দ্ব চলছিল তখন সেখানে ছিল এমন এক ব্যক্তি যার ছিল তথাগত বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত ভক্তি, স্থিতধী জ্ঞান। সে হচ্ছে রাজনর্তকী শ্রীমতী। শ্রীমতির ধর্মনিষ্ঠা অপরিসীম। অদ্বিতীয় ছিল তার বুদ্ধপ্রাণতা। দিনে দু'বার অশোক তরুতলায় বুদ্ধ বেদীতে বুদ্ধ পূজায় গমন করত। অন্তঃপুর বাসিনীরা শ্রীমতীকে অনেক বিদ্রূপ করত। অনেকে ভয় করত, অনেকে শ্রদ্ধা করত। এরমধ্যে মালতী নাম্নী এক গ্রাম্য বালিকা জুটেছে। তার ভাই ও স্বামী তাকে নিঃসহায় একাকিনী রেখে অন্যত্র গিয়ে ভিক্ষু হয়ে গিয়েছে। সে বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি পরম শ্রদ্ধা নিয়ে শ্রীমতীর নিকট প্রায়ই আসত, মানসিক কিছুটা সান্ত্বনা পাওয়ার অভিপ্রায়ে। কিন্তু মানুষ মনে করত-মালতী শ্রীমতীর নিকট আসত নাচ-গান শিক্ষার মানসে। শ্রীমতীকে সবচেয়ে উপহাস করতেন রাজমহিষী রত্নাবলী। তিনি বলতেন- "অপেক্ষা করছি উদ্ধারের জন্য, মলিন মনকে নির্মল করে শ্রীমতীর শিষ্যা হওয়ার পথে একটু একটু এগুচ্ছি"। তা শুনে মহারানী লোকেশ্বরী বলে উঠলেন- শেষ পর্যন্ত তাই হবে। পতিতা আসবে পরিত্রাণের উপদেশ নিয়ে। নাটিকায় বর্ণিত

হয়েছে- যারা পতিতা, তারা প্রভু বুদ্ধের ধর্ম মাহাত্ম্যে পরিত্রাণ লাভে ধন্য হয়েছেঃ যেমন আম্রপালী গণিকা, শ্রীমতী আজ সাধ্বী, নাপিতপুত্র উপালী, গোয়ালা সুনন্দা, পুক্কুস পুত্র সুনীত আজ মহাজ্ঞানী সাধক।

মহারাজ অজাতশত্রু রাজধানীতে বুদ্ধপূজার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন। ভিক্ষুনী উৎপলবর্ণা শ্রীমতীর উপর ভার দিয়ে বাইরে চলে গেলেন। দেবদত্তের শিষ্যরা উৎপলবর্ণাকে সেখানে হত্যা করল। এদিকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত পিতা মহারাজ বিম্বিসার অত্যাচার অবিচারে অনিদ্রায় তিলে তিলে নিষ্পেষিত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। এজন্য মহারাজ অজাতশত্রু পিতৃহত্যা ও বুদ্ধ দেহ হতে রক্তপাতে শংকিত ও অনুশোচনায় অস্থির হয়ে গেলেন। মহারাজ যেন অগ্নিকুন্ডে পতিত হয়ে ধরপর ছটপট করতে লাগলেন। তথাপি রাজমহিষী রত্নাবলী জিদ ছাড়লেন না। বরং আশংকাবোধ করলেন-রাজা বুদ্ধপূজার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করবেন নাকি? শ্রীমতী কিন্তু বুদ্ধপূজা থেকে বিরত হলনা। সর্বদা রাজআজ্ঞা অমান্য করে রীতিমত দু'বেলা বুদ্ধপূজায় গমন করত। অতঃপর রাজমহিষী রত্নাবলী এক দুষ্টবুদ্ধি আঁটলেন- বুদ্ধ যে বেদিকায় অশোক তরুতলে সমাসীন হয়ে সর্বজনসমক্ষে অমৃতবাণী প্রচার করতেন সেই বেদিকায় শ্রীমতী দ্বারা নাচ-গান করাবেন, এই বলে মহারাজ অজাতশত্রু দ্বারা এক নির্দেশনামা জারী করালেন যে, শ্রীমতীকে অশোকতলার বুদ্ধবেদিকায় নাচ-গান করতে হবে অর্থাৎ শ্রীমতীকে ও বুদ্ধকে এতে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবেন এই ছিল রত্নাবলীর উদ্দেশ্য। এই মর্মে শ্রীমতীকে নির্দেশনামা জারী করলেন, শ্রীমতী তাতে সম্মত হল। যথাসময়ে শ্রীমতী নর্তকীবেশ ধারণ ও প্রচুর অলংকারপত্র পরিধান পূর্বক অশোক তরুতলে বেদিকার উপর নৃত্য করতে ও গান করতে উপস্থিত হল। কৌতূহল বশে সেখানে দুই পক্ষীয় লোকে লোকারণ্য। এক পক্ষে বুদ্ধ ভক্তগণ, অপরপক্ষে রাণী রত্নাবলীর অনুসারীবৃন্দ। শ্রীমতী শান্ত সমাহিত চিত্তে নাচতে ও গান করতে আরম্ভ করল। শ্রীমতীর সমস্ত নাচ হয়ে যেতে লাগল নৃত্যাঞ্জলি, গান হয়ে যেতে লাগল গীতাঞ্জলী, বন্দনাগীতি। সাংস্কৃতিক গান ও নাচে অভিজ্ঞা নটী গান ও নাচের ফাঁকে ফাঁকে দেহস্থ সমস্ত বসন-ভূষণ একে একে খুলে খুলে বুদ্ধ বেদীতে পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ নৈবেদ্য সাজাতে লাগল। অবশিষ্ট রইল শুধু একখানি বস্ত্র- তা হচ্ছে ভিক্ষুনীর কাষায়বস্ত্র। শ্রীমতী যেন মুন্ডিতমস্তক একজন ভিক্ষুনী। রত্নাবলীর রক্ষিনীরা নর্তকীকে এই পূজা থেকে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য বার বার নির্দেশ দিল। কিন্তু সে কিছুতেই মানল না। যার অন্তর অচলাভক্তি শ্রদ্ধায় ভরপুর, যার জ্ঞান অতলান্ত গভীরতায় উদ্ভাসিত সেখানে লজ্জাশরম তুচ্ছ, ভয়ভীতি অপগত, রাজার নিষেধাজ্ঞা অমান্য, আপনজীবন তুচ্ছ। এদিকে রাণী রত্নাবলী প্রচন্ড ক্রোধে অগ্নিশর্মা। ক্ষোভে দুঃখে অপমানে ম্রিয়মান। অস্ত্রধারিণী দেহরক্ষিনীদের ভর্ৎসনা করে বললেন, "তোরা এখনো তাকিয়ে আছিস, ও যে রাজার আজ্ঞা অমান্য করছে"। এই বলার সাথে সাথে একজন অস্ত্রধারিণী দেহরক্ষিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে অস্ত্রাঘাতে শ্রীমতীর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল। শ্রীমতী বেদীতে পড়ে ধরফর ছটফট করতে আরম্ভ করল। রক্তে প্লাবিত হল পূজার বেদিকা। এমন সময় অন্যান্য রক্ষিণীরা নটীর পায়েরধূলা মস্তকে ধারণ পূর্বক ক্ষমাপ্রার্থনা করল। মহারাণী

লোকেশ্বরী অতর্কিতে এসে শ্রীমতীকে কোলে নিয়ে বললেন-"শ্রীমতী, তোর এই ভিক্ষুনী বস্ত্র কি আমাকে দিয়ে গেলি?" নটীর পূজা জয়যুক্ত হল। নটী করুণাঘন বুদ্ধের পূজা করতে গিয়ে আত্মাহুতি দিল। তাতে দান পরমার্থপারমী পূরণ করে বলিষ্ঠ হেতুপ্রত্যয় সঞ্চয় করে পরমা শান্তির শক্তিশালী সংস্কার উপার্জন করলো। এই বলে কবিগুরু কাব্যের যবনিকা টানলেনঃ

"সেদিন শুভ্র পাষাণ ফলকে পড়িল রক্তলিখা
সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদ কাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপ পদমূলে নিভিল চকিতে শেষ আরতির শিখা"।

পরিশোধ ঃ শ্যামা

বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি হচ্ছে
কম্মুনা বত্ততে লোকো কম্মুনা বত্ততে পজা
কম্মসত্তা নিবন্ধনা রথসসাণীব যাযরে।

বৌদ্ধ ধর্ম কর্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কর্মদ্বারা প্রাণীগণের উত্থান পতন, সুখ দুঃখ জীবনের সবকিছু বিহিত হয়। রথ যেমন পেরেক দ্বারা আবদ্ধ হয়ে চলে, প্রাণী জগতে কুশলাকুশল কর্মদ্বারা আবদ্ধ হয়ে চলতে থাকে। জগত ও জীবন রহস্যে এই নীতি সমন্বিত বিচিত্র ঘটনা কবি গুরুর সাহিত্যে স্থান লাভ করেছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 'পরিশোধ' নামে ছোট একটি কবিতা লিখেছিলেন ১৯০০ খৃষ্টাব্দে। একই বিষয়বস্তু নিয়ে, একই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিয়ে শ্যামা নামে নাটক লিখলেন ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে। কবিতা ও নাটকের মূল উপাদান অবলম্বন করলেন তৃতীয় খন্ড জাতকের কনবের নামক জাতক কাহিনী হতে। কনবের জাতকের প্রাচীন কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

পুরাকালে বারানসী রাজ্যে রাজা ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে কোন এক গৃহপতি কুলে বোধিসত্ত্ব বজ্রসেন নামে চোরা নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। বজ্রসেন খুব সাহসী ও হস্তীর ন্যায় বলশালী ছিলেন। চোরা নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণকারী ব্যক্তির সহজাত সংস্কার হচ্ছে সে চুরি ছাড়া থাকতে পারে না। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি সর্বদা চৌর্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। কার কি বা সাধ্য এহেন শক্তিশালী চোরকে ধরে? তার জ্বালায় দেশশুদ্ধ অতিষ্ঠ। নগরপালগণ রাজাজ্ঞায় অনেক কৌশল প্রয়োগ করে তাকে একদিন হাতেনাতে ধরে ফেলেন। রাজা আজ্ঞা দিলেন-তার শিরচ্ছেদ কর। নগরপালগণ বজ্রসেনকে দৃঢ়রূপে পিছমোড়া বাঁধ দিয়ে কবরী ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দারুন কশাঘাত করতে করতে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন বারানসীতে শ্যামা নাম্নী এক বারবনিতা ছিল। সে হাজারো লোকের প্রণয়প্রার্থী ছিল। সে বার-বনিতা প্রাসাদ থেকে জানালা দিয়ে দেখতে পেল-রাজপুরুষেরা বোধিসত্ত্ব বজ্রস্নেনকে

বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে। বোধিসত্ত্বের রূপ ছিল অতি মনোরম, অতীব তেজপূর্ণ ও দিব্যলাবণ্যময়। তাকে দেখে গণিকা বোধিসত্ত্বের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল এবং ভাবতে লাগল কি উপায় অবলম্বন করলে এই পুরুষ রত্নকে উদ্ধার করে আপন স্বামীরূপে বরণ করা যায়? এই ভেবে শ্যামা একজন পরিচারিকার মারফতে নগরপালগণের জন্য এক সহস্র মুদ্রা দিয়ে বোধিসত্ত্বকে ছাড়ার জন্য সংবাদ পাঠালেন। কিন্তু কাজ হল না। নগরপালগণ বলল– এ একজন নামজাদা চোর। দুষ্ট ডাকাত। তার অত্যাচারে দেশ বিক্ষুব্ধ। রাজার আদেশ, তার শিরচ্ছেদ করা। এভাবে তাকে ছাড়া যাবে না। যদি তার পরিবর্তে আরেকজনকে পাওয়া যায়, তবে একটা কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ সংবাদে শ্যামা চিন্তিত হয়ে পড়লো। এমন সময় উত্তীয় নামে এক শ্রেষ্ঠীপুত্র এক সহস্র মুদ্রা হস্তে শ্যামার প্রেমাসক্ত হয়ে সামনে হাজির। শ্যামা উত্তীয়কে দেখে বসে বসে কান্নার ভান দেখাচ্ছে। এমন সময় উত্তীয় জিজ্ঞেস করল, ভদ্রে! কাঁদছ কেন? শ্যামা জবাব দিল-আমার ছোটভাই বজ্রসেন চুরিতে ধরা পড়ায় এখন নগরপালগণ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। তাকে উদ্ধার করে আনার জন্য কাউকেও পাচ্ছি না। উত্তীয় বলল–'তাতে এত চিন্তার কি আছে? আমি যাব বজ্রসেনের উদ্ধারের কাজে। অতঃপর শ্যামা তার সাথে প্রণয় করার উদ্দেশ্যে আনীত এক সহস্র মুদ্রাসহ উত্তীয়কে নগরপালগণের নিকট পাঠাল। নগরপালগণ একজন লোকসহ এক সহস্র মুদ্রা পেয়ে বোধিসত্ত্ব বজ্রসেনকে ছেড়ে দিল এবং উত্তীয়কে আটকে রাখল। গভীর রাত্রে নগরবাসীর অজ্ঞাতসারে নগরপালগণ উত্তীয়কে শূলে আরোহণ করিয়ে শিরচ্ছেদ করল এবং রাজাকে খবর দিল যে, মহারাজ, আপনার আজ্ঞানুসারে বজ্রসেনকে হত্যা করা হয়েছে।

বোধিসত্ত্ব বজ্রসেন শ্যামার আলয়ে গমনপূর্বক প্রণয়াসক্তরূপে পরম সুখে জীবন যাপন করতে লাগলেন। কিছুদিন অতীত হওয়ার পর বোধিসত্ত্ব জানতে পারলেন, তিনি এই মহাবিপদ থেকে কি ভাবে রক্ষা পেলেন। উদ্ধারের প্রকৃত বিবরণ অবগতির পর নিজে চিন্তিত হয়ে পড়লেন, আপন জীবনের উপর ধিক্কার এলো। তিনি ভাবলেন, এ রমনী ভীষণ পাপিষ্ঠা, মিত্রদ্রোহিনী। যে প্রেমাকাঙ্ক্ষী নিরপরাধ মিত্রের প্রাণ বধ ঘটাতে পারে, সে অন্যের প্রতি আসক্ত হলে আমার জীবন সংহার করাও তার পক্ষে অসম্ভব নয়। এরূপে শ্যামার অত্যাচার অবিচারে, আজীবন অহরহঃ পাপাচারের প্রতি ঘৃণা এলো। আপন জীবনের আশংকা ও নিরপরাধ মিত্রের প্রাণনাশের জন্য অসীম করুণা বোধিসত্ত্বের অন্তরে প্রবল হয়ে উঠল। অতএব এখান থেকে যত সত্বর পারা যায়, পলায়ন করা উচিৎ। এরূপ চিন্তা করে একদিন বোধিসত্ত্ব বজ্রসেন শ্যামাকে নিয়ে উদ্যান কেলিতে গমন করলেন। সেখানে দু'জনে বেশ আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত হলেন। বজ্রসেন ভাবলেন,-'এই তো আমার পলায়নের উপযুক্ত অবকাশ'। এই ভেবে শ্যামার প্রতি উৎকট আসক্তির ভান করে আলিংগন করবার ছলে তাকে এমনভাবে নিপীড়ন করতে আরম্ভ করলেন, যার ফলে শ্যামা সংজ্ঞাহীন হয়ে ভূতলে পড়ে গেল। এই সুযোগে বজ্রসেন শ্যামার দেহস্থ অলংকার পত্র ছিনিয়ে নিয়ে পলায়ন করলেন। অনেকক্ষণ পর শ্যামার সংজ্ঞা ফিরে আসল। প্রকৃতিস্থ হয়ে শ্যামা দেখল তার দেহস্থ কোন অলংকার দেহে নেই এবং বজ্রসেনও উধাও হয়ে গেছেন। তবু মোহবশে শ্যামা বজ্রসেনের

দুরভিসন্ধি হৃদয়ংগম করতে পারল না। শুধু বজ্রসেনের জন্যই শোকাকুলা। মূল্যবান অলংকার পত্রের জন্য শ্যামার কোন ভাবনা নেই। ভাবনা শুধু বজ্রসেনের জন্য। অলংকার পত্র পয়সা হলে কল্যই পাওয়া যাবে। কিন্তু চিরতরে বজ্রসেনকে হারালাম। অবশেষে শ্যামা নিজ বাসভবনে ফিরে এলো। সে কিছুতেই বজ্রসেনকে বিস্মৃত হতে পারল না। রূপজ মোহের তাড়নায় শ্যামা বজ্রসেনের জন্য পাগল হয়ে গেল। সেজন্য শ্যামা বজ্রসেনকে খোঁজ করে আনার জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে দেশে দেশে লোক পাঠালেন। লোকজন সন্ধান করতে করতে এক প্রত্যন্ত গ্রামে বজ্রসেনের সন্ধান পেল এবং শ্যামার শুভ মর্মস্পর্শী সমাচার জ্ঞাপন করল। কিন্তু বজ্রসেন শ্যামার প্রেমাসক্ত আবেদনে কোন প্রকার সাড়া দিলো না। কিছুতেই বজ্রসেন ফিরে এলেন না। দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বজ্রসেন অচল অটল। কথিত আছে,-বজ্রসেনের শোকে শ্যামা আত্ম-হত্যা করেছে।

আগেও বলেছি-বৌদ্ধধর্ম কর্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কর্ম ও কর্ম বিপাক এক এবং অভিন্ন। উভয়ই আনুষঙ্গিক হেতু প্রত্যয় সমন্বিত। উৎকট কর্মের খাজনা বা ঋণ পরিশোধ একদিন করতেই হয়। বোধিসত্ত্ব বজ্রসেনের জীবনে চৌর্যবৃত্তি অকৃতজ্ঞতা ও ভোগাসক্তি জনিত যত প্রকার অপরাধ সংঘটিত হোক না কেন, শ্যামার অমানবিক কর্মকান্ডের তুলনায় তা গৌণ। বজ্রসেনের রূপজ মোহের বীভৎস তাড়নায় নিরপরাধ প্রেমাকাঙ্ক্ষীর প্রতি শ্যামার মিত্রদ্রোহিতা, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রেম দানের পরিবর্তে সুকৌশলে নিরীহ ব্যক্তি উত্তীয়কে ফাঁসির কাষ্ঠে মৃত্যুদন্ড দান, বজ্রসেনের জীবনোদ্ধার কর্মটি আপাতঃ শুভ বলে বিবেচিত হলেও শ্যামার আন্তরিক উদ্দেশ্য ছিল একান্ত বদ, সম্পূর্ণ আসঙ্গ লিপ্সা, কামনাসক্তি সঞ্জাতঃ মৈত্রী করুণা প্রজ্ঞা প্রণোদিত নয়। এজন্য বজ্রসেনের আপন জীবনের প্রতিও ধিক্কার। তদ্ধেতু শ্যামা বজ্রসেনের সাথে পুনর্মিলনের জন্য পাগলিনী সাজলেও বজ্রসেন তা ভ্রুক্ষেপ করলেন না। শ্যামার সান্নিধ্য লাভকে বরং ঘৃনার চক্ষে দেখলেন। প্রেমাসক্তির অত্যাগ্রহে সাড়া না দেওয়া অতিশয় কঠিন ত্যাগ। ফলে বজ্রসেনের নৈতিক জ্ঞান এরূপ প্রবল প্রখর হয়ে উঠেছিল যে, তিনি শ্যামাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারলেন না। অমানুষিক অত্যাচারের সাথে আপোষ করলেন না। এটাই বোধিসত্ত্ব জীবনের বৈশিষ্ট্য। এজন্য কবিগুরুর অন্তরে গভীর বৌদ্ধপ্রাণতার পরিচয় স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

অচলায়তনঃ গুরু

পালি সংযুক্তনিকায় গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে, তথাগত বুদ্ধ কালাম গ্রামনিবাসী জনগণকে উপলক্ষ্য করে বলেছেন-

মা অনুস্সবন, মা পরম্পরায়, মা ইতিকিরিযায, মা পিটক সম্পদানেন, মা তক্কহেতু, মা নয়হেতু, মা আকার বিতক্কেন, মা দিট্ঠি নিজ্ঝান খন্তিযা, মা ভব্য রূপতায়, মা ব্রাহ্মনো, মা গরূতি।

হে কালামগণ। যদি উন্নতি পথের পথিক হতে চাও, যদি লক্ষিত বিষয় অর্জন করতে চাও, যদি জ্ঞানের উন্নতি সাধন করতে চাও; তবে ছাড় শ্রুতিপরম্পরা, ছাড় অন্ধতা জড়তা, ছাড় বংশানুক্রমিক আগত রীতিনীতির ধারা, ছাড় মিথ্যা ধারণা, অমূলক দৃষ্টি, ছাড় শাস্ত্রোক্তির নির্ভরতা, ছাড় কূটতর্ক বাগ্বিতণ্ডা, ছাড় মতামতের অনড় বালাই, ছাড় শ্রমন ব্রাহ্মণের ফতোয়া, ছাড় গুরুমতের দোহাই, বাহ্যিক শোভা সৌন্দর্যে, সভ্যতা ভব্যতায় মানুষের বিচার করো না এমন কি, আমি তথাগত যদি কিছু বলি, তথাপি আপন চিন্তা-ভাবনা, বিবেক বুদ্ধি, যুক্তি, বিচারের সহিত যদি না মিলে যা জীবনের হিতকর বলে যদি বিবেচিত না হয়, তা মেনে নিও না। পরের মুখে ঝাল খেও না। বাহ্যিক রূপে বিস্মিত হয়ো না। বিচার না করে কোন কিছু গ্রহণও করো না, অথবা ত্যাগও করোনা। পূর্ব পুরুষের প্রচলিত মতামত জেনে, পরের বই পড়ে, শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, গুরু মহাশয়ের মুখে মুখে শুনে, কিংবা দশ জনের থেকে খবর নিয়ে যে জানা-তা প্রকৃত জানা নয়। কোন বিষয়বস্তুর প্রকৃষ্ট অনুধাবন, আত্মানুশীলন আত্মোপলব্ধিই প্রকৃত জানা বা জ্ঞান।

হিন্দুধর্ম যখন বিচিত্র কু-সংস্কারাচ্ছন্ন ক্রিয়া কলাপে পরিপূর্ণ, বৌদ্ধধর্ম যখন বজ্রযান, তন্ত্রযান, মন্ত্রযান ইত্যাদি নানা প্রকার যান বাহনের-বিকৃতির মধ্যে নিমজ্জিত, প্রকৃত ধর্মের মধ্যে অন্ধত্ব, জড়ত্ব, ব্রত-উপবাস জীর্ণ আচার-ব্যবহারের প্রাধান্য, ভূত, প্রেত, একজটা দেবীর কাল্পনিক ভয়, হাঁচি, টিকটিকির রব, পাঁজি, পুঁথি, গুরু পুরোহিতের শাস্ত্রের দোহাই, তাবিজ মাদুলি, ঝাড়া-ফু, ভোজবাজি ইত্যাদি বাধা বিপত্তি, দুর্নিমিত্ত, অমংগল প্রভাবে ভারত বর্ষের প্রগতি যখন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল; সহস্র অন্ধ বিশ্বাসে আচ্ছন্ন হয়ে অচল অক্ষম, দুর্গম দুরতিক্রম্য পর্বত আয়তন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল; তখন কবিগুরু ১৩১৮ সালে শিলাইদহ বসে বৌদ্ধ দিব্যাবদান মালার পঞ্চক কাহিনী থেকে উপাদান গ্রহণ করে 'অচলায়তন' নাটকখানি লিপিবদ্ধ করেছেন। তার ছয় বৎসর পর এই অচলায়তন নাটকখানিকে সহজবোধ্য অভিনয়োপযোগী করে আরেকটি সংস্করণ প্রকাশ করেন, তার নামকরণ করলেন 'গুরু'।

পঞ্চকের কাহিনীতে পাওয়া যায়, পুরাকালে অদীশপূন্যকে আচার্য করে আর্যগুরু যে বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কালে কালে প্রাণহীন অন্ধ কুয়াসাচ্ছন্ন কুসংস্কারের

পুনরাবৃত্তিতে তা অচলায়তনরূপে পরিণতি লাভ করে। সেই অচলায়তন বাইরের সমস্ত যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন। এখানে শুধুমাত্র আছেঃ

"চারপাশে পাথরের চারটি প্রাচীর, বন্ধ দরজা, নানা রেখার গণ্ডি, স্তুপাকার পুঁথি আর অহোরাত্র মন্ত্র পাঠের গুঞ্জনধ্বনি"। পঞ্চক এইসব তন্ত্র-মন্ত্র আচার আচরণ, সূত্র-আবৃত্তি শিখতে চায় না। পছন্দ করে না। সে জগৎ ও জীবনের প্রগতিবাদী। সে সর্বদা ক্রন্দন করে অচলায়তনের কারারুদ্ধ অন্ধকার থেকে উন্মুক্ত আলোর জন্য। পঞ্চক কুসংস্কারের জড়তার আবরণে নিজকে আবৃত না রেখে মুক্তি পিপাসু হয়ে উঠতে অনুসন্ধিৎসু। প্রাচীন অন্ধত্বের প্রাচীর ভেংগে সে আধুনিক সাম্য সৌম্য সভ্যতার প্রাচীর গড়ে তুলতে চায়। এজন্য তার প্রাণ বড় উদগ্রীব।

পঞ্চকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাপঞ্চক অচলায়তনের স্থিতিশীল আচার-অনুষ্ঠান নিষ্ঠাকে বিশুদ্ধ ধর্ম, একমাত্র সত্য ধর্ম বলে বিবেচনা করে এবং প্রাণপণে মানে ও সংরক্ষণ করে। তাই বলে ছোট ভাই পঞ্চকের বিদ্রোহের প্রতি দ্রোহ বিদ্বেষ অশ্রদ্ধা নেই। বরং চিন্তায় উৎকণ্ঠিত ছিল যে, কিরূপে প্রাচীনত্ব ও অভিনবত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়। তাই মহাপঞ্চক দ্বিধাদ্বন্দ্বে কাল কাটাচ্ছেন। অতঃপর অনেক সাধ্য সাধনা, অনেক চেষ্টা যত্ন করে অচলায়তনের প্রাচীন প্রাচীর ভেংগে চুরমার করে ফেলতে সক্ষম হয়। প্রাচীন কুপ্রথার কুসংস্কার ধ্বংস করে নবালোকে নূতন উদ্দীপনায় নূতন সংস্কারের সমাজ গঠনের বিশুদ্ধ আয়তন ক্ষেত্র গড়ে তোলার ভার অর্পিত হল পঞ্চকের উপর। যোগ্য পুরুষের উপর যোগ্য নীতি আদর্শ সৃষ্টির দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে যথাকালে।

ভারতবর্ষে ধর্ম সংস্কৃতির দুইটি ধারা। একটি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি। অপরটি শ্রামণ্য সংস্কৃতি। দুই ধারার উৎস কিন্তু এক ও অভিন্ন। তবে গতিধারার অগ্রগতি, বিস্তার, প্রভাব প্রতিপত্তির মধ্যে ব্যবধান ও বৈসাদৃশ্য আছে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ভারত সীমান্ত অতিক্রম না করে আপন জন্মভূমিতেই সীমিত। আর শ্রামণ্য সংস্কৃতি ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে বহির্ভারতে বা বহির্বিশ্বে বিস্তার লাভ করে বিশ্বের বৃহত্তম মানব গোষ্ঠীর মধ্যে স্বীয় মহত্ত্ব ও প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। শ্রামণ্য সংস্কৃতির অগ্রগতি আজও বিশ্বে অব্যাহত। উভয় সংস্কৃতির অগ্রগতি সাধনা ক্ষেত্রে পারমার্থিক দৃষ্টিতে কিরূপ, তা আধ্যাত্মিক সাধক পুরুষেরই বিবেচ্য, জ্ঞাতব্য ও উপলব্ধির বিষয়, সাধারণের নহে, কবিগুরু উভয় সংস্কৃতির মহত্ব আরোপ করেছেন। কোনটাকেই অস্বীকার করেননি। কোনরূপ তন্ত্রে-মন্ত্রে সংহিতায় তিনি আপন জীবনকে ভাসিয়ে দেননি। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ব্রহ্মবাদ ও শ্রামণ্য সংস্কৃতির ব্রহ্ম বিহার (মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা) ধর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন অত্যধিক। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির যেটা সর্বোচ্চ শিখর, কবিগুরু তাতে আরোহণ করেছেন। শ্রামণ্য সংস্কৃতি যেমন বৌদ্ধধর্মে স্বীকৃত, ব্রহ্মত্ববাদও অস্বীকৃত নহে। সুতরাং ব্রাহ্ম মতাবলম্বী হয়ে ব্রহ্ম বিহারের মহত্ব স্বীকার বিচিত্র নহে, নিতান্ত স্বাভাবিক। বৌদ্ধ ধর্মে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবিহার আদর্শের বিচারে এক, অভিন্ন। কাজেই কবিগুরুর সুবিশাল দৃষ্টি শ্রামণ্য সংস্কৃতি এড়াতে

পারেনি। শ্রামণ্য সংস্কৃতির প্রচার প্রতিষ্ঠায় প্রথমতঃ বুদ্ধ, বুদ্ধের প্রাজ্ঞ ভিক্ষুসংঘ, দ্বিতীয়তঃ অশোক, কনিষ্ক, হর্ষবর্ধন প্রভৃতি রাজণ্যবর্গ, রাত ব্রাহ্মণ রাজবংশ, খড়গবংশ, দেববংশ, চন্দ্রবংশ, পালবংশ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজবংশ, সর্বশেষ দেশ বিদেশে বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রচার প্রতিষ্ঠায় যাঁর অবদান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তিনি হলেন কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি একক প্রচেষ্টায় শ্রামণ্য সংস্কৃতি প্রচারে বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর পেছনে কোন সাম্রাজ্য শক্তি, রাজশক্তি কিংবা সংঘশক্তি ছিল না।

তাঁর সমগ্র সাহিত্য আলোচনা গবেষণা করলে এই প্রতীতি জন্মে যে, শ্রামণ্য সংস্কৃতির প্রতিই তাঁর আকর্ষণ, অন্তর ছিল অতলান্ত শ্রদ্ধায় প্রগাঢ়। শ্রামণ্যসংস্কৃতি হোক ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি হোক গোঁড়ামিপূর্ণ আচার নিষ্ঠা কবিগুরু কোনদিন সহ্য করেননি, কোনদিন মেনে নিতে পারেননি। যখন যেটার মধ্যে জগৎ ও জীবনের সাথে সংগতিহীন আচার অনুষ্ঠান লক্ষ্য করেছেন, সংস্কৃতির বিশুদ্ধ ধারায় আবিলতা আবর্জনা জন্মেছে প্রত্যক্ষ করেছেন, তখনি তার বিরুদ্ধে লেখনি ধারণ করেছেন এবং জয়যুক্ত হয়েছেন। এই অচলায়তন নাটকেও তাই।

কবিগুরু অচলায়তন ও গুরু নাটকের মধ্যে ভারতীয় উভয় সংস্কৃতিতে অন্ধ কুসংস্কারের বিরোধিতা করে বৌদ্ধ মৈত্রী করুণার আদর্শপুষ্ট স্বীয় মানবিক সত্য ও সভ্যতার জয় ঘোষণা করে গিয়েছেন।

এই অচলায়তন নাটকের ব্যাখ্যা কবি স্বয়ং এরূপ দিয়েছেনঃ

"যে বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম করে, আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেংগে ফেলে। যে-বোধে আমাদের মুক্তি, দুর্গং পথস্ তৎ কবয়ো বদন্তি-দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে আসে-আতংকে সে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে, তাকে শত্রু বলেই মনে করি-তার সংগে লড়াই করে তবে তাকে স্বীকার করতে হয়, কেননা 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। আমি তো মনে করি আজ ইউরোপে যে-যুদ্ধ বেঁধেছে সে ঐ গুরু এসেছেন বলে। তাঁকে অনেকদিনের টাকার প্রাচীর, মানের প্রাচীর আভিজাত্যের প্রাচীর ভাংগতে হচ্ছে"।

ধর্মের নামে অধর্ম, বিনয়ের নামে অবিনয়, সুনীতির ছলে দূর্নীতি এবং তন্ত্র-মন্ত্র ভোজবাজির দাপটে ভারতবর্ষীয় আশ্রম বিহারে যখন বিপুল অর্থ সম্পদে, বহুমূল্য রত্ন অলংকারে পরিপূর্ণ হয়ে অচলায়তন রূপ সৃষ্টি হয়েছিল, সেই অর্থ লোভে শক, হুণ প্রভৃতি পশ্চিম দেশীয় লোকেরা ভারতীয় আশ্রম বিহার আক্রমন রূপে গুরু এসেছিলেন আর গুরু এসেছিলেন বাংলাদেশী মুক্তি সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধা রূপে। অচলায়তন ও গুরু নাটকে সর্ব শক্তির আধার হচ্ছে গুরু। জড় শক্তির পরাজয়ে গুরুর অবদান অবশ্যই স্বীকার্য। এই নাটকের পটভূমিকার পরিচয় প্রসংগে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,-"উপখ্যানটির মধ্যে পঞ্চক ও মহাপঞ্চক দুইটি বিরুদ্ধ শক্তি। ইহারা পরস্পর সহোদর ভ্রাতা। সুতরাং সম্বন্ধ ঘনিষ্ট। অথচ একজন বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি, অপরজন মূর্তিমান নিষ্ঠা। পঞ্চক যা কিছু আচার, যা কিছু প্রাচীন প্রথা, যা কিছু নিষেধ, তাকে আঘাত করার জন্য উদগ্রভাবে ব্যস্ত। তারই জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতা মহাপঞ্চক প্রাচীন আচার নিষ্ঠায় নিষ্ঠুর। অচলায়তনের সকল প্রাচীন প্রথায় তার অচলাভক্তি। আসল কথা, নিষ্ঠা ও নিষ্ক্রমনের মধ্যে বিরোধ। কিন্তু কবিগুরু এই বিরোধকেই চরম বলে স্বীকার করলেন না। গুরু আসলেন, গুরুর দশার প্রভাবে অচলায়তনের প্রাচীর ধ্বংস হল। বাহিরের আকাশ দৃশ্যমান হল। বাহিরের বাতাস আয়তনের প্রাংগনে বইতে লাগল। অস্পৃশ্য দর্ভক, শোন পাংশু সকলে নিঃসংকোচে এগিয়ে আসল। তাতে মনে হল পঞ্চকের জয়, বিদ্রোহের জয়। এদিকে মহা পঞ্চকের নিষ্ঠাকে কেহ অশ্রদ্ধা করতে পারে না। সেই বিধ্বস্ত আয়তনেই নুতন করে সাধনার আয়োজন হল। নিষ্ঠার মধ্যেই সত্যের রশ্মি আছে। চঞ্চলতাই জীবনের একমাত্র লক্ষণ নহে। অঞ্চল বিদ্রোহ সমাহিত হলে, প্রশান্ত রূপ ধারণ করলে জীবন সত্যকে অন্তররাজ্যে প্রবেশের সিংহদ্বার উন্মোচিত হয়। সত্য প্রকটিত হওয়ার পরোক্ষ উপলক্ষ্য হচ্ছে অসত্য। তাতেই হয় সত্যের প্রকৃষ্ট মূল্যায়ন। সত্যের জয়”।

মালিনী

কবিগুরু ১৮৯৬ইং মালিনী নাটক লিখলেন পরবর্তী কালের বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ মহাবস্তু অবদানের ছোট একটি কাহিনী অবলম্বনে। বস্তুতঃ এই নাটক পূর্ণাংগ মহাবস্তু অবদানের উপকরণ গ্রহণে নয়, অনেকাংশে কবির লন্ডন বাসের সময় স্বপ্নে দৃষ্ট ঘটনাকে অবলম্বন করে লিখিত। এই নাটকে বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে ভারতের বৈদিক ধর্মের চিরাচরিত নীতি-যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকান্ড আচার-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সাথে যুক্তিসিদ্ধ মানবতাবাদী বিচারনিষ্ঠ শ্রামন্য ধর্মের ভীষণ ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে কিরূপে বৌদ্ধ ধর্মের পসার, প্রচার প্রতিষ্ঠা লাভ করল-তা-ই কবি মালিনী নাটকে নাট্যরূপ দান করলেন। রাজ অন্তঃপুরে শ্রামণ্য ধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি ভিত্তি করেই এই নাটকের সূচনা। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অধ্যুষিত রাজ্যে বারানসী রাজ কৃকির কন্যা মালিনী বৌদ্ধ ভিক্ষু কাশ্যপের কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করল। এজন্য ব্রাহ্মনগণ ক্ষেপে গেলেন। রাজা ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় মালিনীর নির্বাসন দণ্ড দিলেন। রাজকন্যা মালিনীকে এ রাজ্যে এক সপ্তাহ অবস্থানের অনুমতি দেওয়া হল। ইতোমধ্যে ব্রাহ্মণগণ ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করে। ভীষণ উত্তেজিত ব্রাহ্মণগণ তাদের অন্যায় সমর্থনের জন্য দৈবশক্তিকে আরাধনা করলে নির্বাসন দন্ডে দন্ডিতা রাজকন্যা মালিনী দেবী প্রতিমাবৎ ব্রাহ্মণদের মধ্যে উপনীত হল। সকলে মনে করল-স্বয়ং দেবী ভক্তের বাঞ্ছাপূর্ণ করতে অবতীর্ণ হয়েছেন। অতঃপর মালিনীর মধ্যে অসাধারণ শক্তি, সর্বজীবে মৈত্রী করুণা, সেবা মাধুর্য, জীব সেবার মহিমার প্রভাব লক্ষ্য করে ব্রাহ্মণগণ অভিভূত হলেন। অবশেষে মালিনীকে ও মালিনীর স্বীকৃত সার্বজনীন ধর্মকে গ্রহণ করলেন। পরিশেষে মালিনীর নির্বাসন দণ্ডাদেশ জোরদার করার প্রবৃত্তি, ভিক্ষু কাশ্যপকে হত্যা করার যত প্রকার প্রচেষ্টা চলছিল তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। অধিকন্তু তাঁদের সমস্ত শক্তি শ্রামণ্য ধর্মের বলিষ্ঠ পরিপোষক

ও সহযোগী হয়ে দাঁড়াল। যারা ক্ষিপ্ত হয়ে মালিনী ও ভিক্ষু কাশ্যপের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তারা আর ফিরে আসে না। সবাই বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে যায়। আত্মীয় পরিজন, উজির নাজির, সরকারী, বেসরকারী কর্মচারী, প্রজাবর্গ সবাইর একই অবস্থা-মালিনীর ধর্ম গ্রহণ করা। কিন্তু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ক্ষেমঙ্কর মালিনীর অবলম্বিত নবধর্ম স্বীকার না করে প্রিয়বন্ধু সুপ্রিয়কে দায়িত্ব দিয়ে প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে অন্যদেশ থেকে সৈন্য সংগ্রহে যাত্রা করেছে। এদিকে সুপ্রিয়ও মালিনীর প্রভাবে অভিভূত হয়ে গেল। অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মকে সত্যধর্ম বলে গ্রহণ করল।

সুপ্রিয় এতদিন বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করে যাগযজ্ঞ সম্পাদন করে যে অমৃতধর্ম উপলব্ধি করেনি, আজ মালিনীর ধর্মে তার সবকিছু পেয়েছে। অন্যদিকে ক্ষেমঙ্করের ধর্মদ্রোহ ও রাষ্ট্রদ্রোহিতা সূচক ষড়যন্ত্রের কথা সুপ্রিয় রাজার কাছে ফাঁস করে দিল। ফলে রাজা সময়ে সৈন্য পাঠিয়ে ক্ষেমঙ্করকে বন্দী করে আনল। রাজসভায় বিচারের প্রাক্কালে ক্ষেমঙ্কর বিশ্বাস ঘাতক বন্ধু সুপ্রিয়কে তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাতে হত্যা করল। স্বয়ং রাজার চোখের সামনে নিঃসংশয়ে হত্যাকাণ্ড সহ্য করতে না পেরে রাজা ঘাতককে খড়গ আনার আদেশ দিলেন। এই চরম আঘাতের মুহূর্তেও মালিনী বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শকে রক্ষা করে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় বলে উঠলঃ

"মহারাজ ক্ষেমঙ্করকে ক্ষমা কর" এটাই মালিনী নাটকের সার সংগ্রহ। বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শ হচ্ছে– অমৃতময় মহাবাণী যা বৌদ্ধ সাহিত্যে মহামন্ত্ররূপে দেশ দেশান্তরে বিস্তারিত, প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত। অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে, সাধুতা দ্বারা অসাধুকে, দানের দ্বারা কৃপণকে, সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয় করবে। মালিনী মৈত্রী, করুণা, ক্ষমা, ত্যাগ, তিতিক্ষা যজ্ঞে জগতের পাপ-তাপ, হলাহল, ঈর্ষা, হিংসা ও বিশ্বাসঘাতকতা সবাইকে জয় করেছে। তথাগত বুদ্ধের এই করুণাঘন স্বরূপ কবিগুরুর অন্তরে চিরস্থিত প্রোজ্জ্বল ধ্রুব তারার মত অন্তর্লীন হয়ে রয়েছিল। মালিনী নাটকে কবি প্রদর্শন করলেন যে মানব ধর্ম লৌকিক শাস্ত্রীয় ধর্ম অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।

চন্ডালিকা

বৌদ্ধধর্মের নীতি হচ্ছে- এ জগতে কেউ জন্ম দ্বারা চন্ডাল কিংবা ব্রাহ্মণ হয় না। কৃতকর্ম দ্বারাই মানুষ চণ্ডাল বা ব্রাহ্মণ হয়।

কবিগুরু চন্ডালিকা নাটক লিখলেন ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে আবার চন্ডালিকা নামে নৃত্যনাট্য লিখলেন ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে। এই দু'য়ের মধ্যে বিষয়বস্তুর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্য আদর্শের মধ্যে পার্থক্য নেই। এই মূল আদর্শ উদ্দেশ্য হল,- ভারতীয় সামাজিক ঘৃণ্য বর্ণ-বৈষম্য, হিংসাত্মক অস্পৃশ্যতা, জাতি-ভেদ-প্রথা অসাম্য নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সামান্য একটি

ঘটনা অবলম্বন করে যুগ-যুগান্তরের কলংক মোচন প্রকৃত মানবতাবোধের প্রতিষ্ঠা।

নাটকের ঘটনাস্থান শ্রাবস্তী। তখন তথাগত বুদ্ধ শ্রাবস্তীর অনাথপিন্ডক শ্রেষ্ঠী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জেতবন বিহারে বাস করছিলেন। একদিন বুদ্ধের প্রিয় সেবক শিষ্য আনন্দ এক গৃহস্থ বাড়ীতে নিমন্ত্রন খেয়ে বিহারে ফিরছিলেন। এমন সময় তার বড় জল পিপাসা পেল। তিনি দেখলেন-একটি মেয়ে কূপ থেকে জল উঠাচ্ছে। মেয়েটি জাতে ছিল এক চন্ডাল কন্যা। তার নাম ছিল প্রকৃতি। আনন্দস্থবির তার কাছে জল চাইলেন। তিনি চন্ডালকন্যা প্রদত্ত জল খেয়ে পিপাসা মিটালেন। প্রকৃতি আনন্দ স্থবিরের অনিন্দ্যসুন্দর আকৃতি, চির ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চেহারায় মুগ্ধ হয়ে গেল এবং তাকে পাওয়ার জন্য বাসনা হল। প্রকৃতির মা নাকি যাদুবিদ্যা জানতো। প্রকৃতির ইচ্ছা পূরণ করার জন্য মাকে আকুতি জানাল। মা প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষানুসারে আংগিনায় গোবর লেপে একটি বেদী প্রস্তুত করে আগুন জ্বালাল। আগুনের মধ্যে মন্ত্রোচ্চারণ করে করে একশত একটি অর্কফুল নিক্ষেপ করল। আনন্দ স্থবির এই যাদুশক্তি রোধ করতে পারলেন না। রাত্রে চন্ডালিনীর বাড়ীতে এসে হাজির হলেন। প্রকৃতি আনন্দকে দেখে আনন্দে অভিভূত হয়ে গেল। প্রথমতঃ তাঁকে বসার জায়গা দিল। পরে বিছানা পাততে আরম্ভ করল। অথচ আনন্দ স্থবিরের মুখ বড় বিমর্ষ। মনে ভীষণ পরিতাপ। বিপদ অতিশয় সন্নিকটে। এমনসময় আনন্দ, করুণাঘন তথাগতকে স্মরণ করলেন। অন্তর্যামী বুদ্ধ শিষ্যের মানসিক অবস্থান জানতে পেরে এমন এক ঋদ্ধিশক্তি প্রয়োগ করলেন-যার ফলে চন্ডালিকার বশীকরণ বিদ্যা নস্যাৎ হয়ে গেল। আনন্দ সুস্থচিত্তে বিহারে ফিরে এলেন।

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় হাড়ি-ডোম, মুচি, মেথর, ম্লেচ্ছ পুক্কুস, চামার, চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ জাতিসমূহ সমাজে অপাংক্তেয়, অস্পৃশ্য ঘৃণিত লাঞ্ছিত অপমানিত, অশুচি। তাদের সাথে উচ্চবর্ণের আচার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ। আহার বিহার সামাজিক সম্পর্ক অকর্তব্য। আবার দেখা যায় চন্ডালের সন্তানও মহৎ গুণের অধিকারী হয়। পতিতা রমনীর গর্ভে কত কত মুনি-ঋষি যোগীর আবির্ভাব ঘটে। তাই প্রকৃতি নিজেকে চন্ডাল বলতে রাজী নয়। সে দৃঢ়তার সাথে বলতে চায়, যে ধর্ম মানুষকে নীচ করে, হীন করে, সে ধর্ম প্রকৃত ধর্ম নয়, তা মিথ্যা প্রহসন মাত্র। ভিক্ষু শ্রেষ্ঠ আনন্দ আমাকে 'জল দাও' বলে জন্মান্তরের অপমান থেকে উদ্ধার করেছেন। যে মহামানব সকল প্রকার ভেদ বৈষম্যের উর্দ্ধে, সমগ্র মানব জাতিকে এক অখণ্ড জাতিতে পরিণত করতে চেয়েছেন, যিনি সমদর্শী, সমমর্মী, যিনি কোনরূপ দাসত্বকে, মানবতার গ্লানিকে সহ্য করতে পারতেন না- আমি তাঁর শিষ্যা। আমি চণ্ডাল নই, আমি অখন্ড অভিন্ন মানব গোষ্ঠীর একজন সদস্য। কবিগুরু চন্ডালিকা নাটকে অন্ধ সংস্কার অস্পৃশ্যতা বর্জনের মানবিক ব্যাখ্যা করে বৌদ্ধ ধর্মের সাম্য মৈত্রী করুণার আদর্শ পুষ্ট স্বীয় মানবিক সত্যের বিজয় ঘোষণা করেছেন।

নগরলক্ষ্মী

পালি বিনয়পিটকে শ্রাবস্তীর দুর্ভিক্ষের বর্ণনা আছে। এক সময় শ্রাবস্তী নগরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। নগরবাসী ভীষণ দুঃখ দৈন্যে অতি কষ্টে গরু ঘোড়ার আহার্য ভক্ষণ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ভিক্ষুগণ ভিক্ষাপাত্র হস্তে পিন্ডপাত্রে বা ভিক্ষায় বের হলে ভিক্ষা মিলত না। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে শ্রাবস্তী নগরে হাহাকার ধ্বনি উঠল। এমন কি, গৃহস্থ দায়কগণ লাল রঙের গরুর বাচ্চাকে লাল চীবর পরিহিত ভিক্ষু মনে করে ঘরের দরজা বন্ধ করে পলায়ন করত। মানুষের এই দুর্ভোগের দিনে করুণাঘন বুদ্ধের অন্তরে আর্ত মানবতার সেবায় বোধি চিত্তের করুণা স্বতঃ উৎসারিত হয়ে উঠল। তখন বুদ্ধ দূর্ভিক্ষের করাল গ্রাসের মুখে অন্নদানের বিষয় ভেবে ধনিক বনিক শ্রেষ্ঠী ভক্তগণকে ডেকে ক্ষুধার্ত মানুষের অনুদানের আহ্বান জানালেন। সকলেই মাথা নত করে রইল। অবশেষে শ্রাবস্তী নগরে ভয়ানক দূর্ভিক্ষের ক্ষুধা মিটাবার উদ্দেশ্যে অনাথ পিন্ডিকের কন্যা ভিক্ষুনী সুপ্রিয়া আর্ত মানবতার সেবায় এগিয়ে আসল। এহেন দুর্ভোগের দিনে করুণাঘন বুদ্ধ দায়িত্ব দিলেন ভিক্ষুনী সুপ্রিয়ার উপর। জনসেবা ও করুণার আদর্শে অনুপ্রাণিত সুপ্রিয়া মহামানবের আদেশ মাথায় তুলে নিয়ে বলল-যারা খাদ্যের জন্য ক্রন্দনরত তারা আমার সন্তান সদৃশ। অসামান্য অতিমানবিক মানসিক শক্তির জোরে শুধু ভিক্ষাপাত্র সম্বল করে ক্ষুধার্ত নগরীর খাদ্য যোগানের গুরু-দায়িত্ব গ্রহণ করায় সকলে বিস্মিত হয়ে গেলেন। ভিক্ষুনী সুপ্রিয়া তথাগত বুদ্ধের মানব হিতৈষণা, মৈত্রী, করুণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দুর্ভিক্ষ নগরীতে মাতৃ-স্নেহ উজাড় করে দিলেন। সুপ্রিয়া উপলব্ধি করলেনঃ

জগতোপকৃতি রেব বুদ্ধপূজা
তদপকৃতি লোকনাথ পীড়া।

জগতের উপকার করাই বুদ্ধপূজা। জগতের অপকার করা লোকনাথ বুদ্ধকে পীড়া দেওয়া। আর্ত মানবের সেবায় বোধিচিত্তের করুণা স্বতঃ উৎসারিত চিত্তে তিনি বুদ্ধের পূজা করেই ধন্যা হলেন।

সাধারণতঃ মানুষের ধারণা লক্ষ্মী হচ্ছে অর্থ-সম্পদ দাত্রী দেবতা। লক্ষ্মী দেবীর আরাধনায় মানুষ ভোগ সম্পদের মালিক হয়। ভিক্ষুনী সুপ্রিয়ার কর্মকৃতিত্বের প্রভাবে শ্রাবস্তী নগরের দূর্ভিক্ষ নিরসিত হল। তিনি নগরের লক্ষ্মী স্বরূপা। এজন্য কবিগুরু কবিতার নামকরণ করলেন নগর-লক্ষ্মী।

মূল্যপ্রাপ্তি

অবদানশতকের ছোট একটি কাহিনী অবলম্বন করে কবিগুরু "মূল্যপ্রাপ্তি" কবিতা লিখেছেন। অবদানশতকের সংক্ষিপ্ত কাহিনীটি নিম্নরূপঃ-

বুদ্ধ তথাগতের আগমনের পূর্বে রাজা প্রসেনজিৎ তীর্থঙ্করদের পূজা করতেন। বুদ্ধের আগমনের পরে একমাত্র বুদ্ধপূজা ছাড়া অন্য কারো পূজা করতেন না। যখন তথাগত বুদ্ধ জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন, তখন ফুল বাগানের একজন মালী রাজাকে উপহার দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি মনোরম বড় পদ্মফুল এনেছিল। তীর্থঙ্কর এটার দাম জিজ্ঞেস করলে অনাথপিণ্ডদ এসে পদ্মফুলের দাম দ্বিগুণ বাড়িয়ে ফেললেন। তারা ফুলের দর চড়াতে চড়াতে শতগুণ বাড়িয়ে ফেলল। তখন মালী ভাবল-যেই মহামানবের উদ্দেশ্যে পুষ্প-পূজার নিমিত্ত আমার ফুল নিয়ে এত বাড়াবাড়ি চলছে, সেই মহান পুরুষ না জানি কেমন ব্যক্তি ? স্বয়ং গিয়ে যদি পুষ্প দ্বারা পূজা কার্য সম্পাদন করি, না জানি কত পুণ্য বৃদ্ধি হয়। আমি একবার তাঁর দর্শনে গমন করব। মালী পদ্মফুলটি বিক্রী না করে তা নিয়ে বুদ্ধ সকাশে উপনীত হল এবং অনাথপিণ্ডদের মুখে বুদ্ধের মহত্বপূর্ণ ভূয়সী প্রশংসা শ্রবণপূর্বক ঐ ফুল বুদ্ধ চরণে নিবেদন করল। ইতিমধ্যে ফুলটি একটি বৃহৎ চক্রাকার ধারণ করল। বুদ্ধের হস্তে সমর্পণ করার সাথে সাথে ফুলটি বুদ্ধের মস্তকোপরি কুণ্ডলাকারে সন্নিবেশিত হল। এতে মালী বিস্মিত হয়ে গেল এবং তথাগতের নিকট কতক আধ্যাত্মিক উপদেশ যাঞ্ছা করল। বুদ্ধ সরাসরি মালীকে কিছু না বলে আনন্দ স্থবিরের নিকট মন্তব্য করলেন, এই লোকটি ভবিষ্যৎ জন্মে 'পদ্মোদ্‌ভব' নামে একজন মহত্তর বুদ্ধ হবেন।

বৌদ্ধধর্ম কর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে যেরূপ কর্ম করবে সে সেরূপ বিপাক লাভ করবে। মালী গভীর শ্রদ্ধাচিত্তে ফুল দ্বারা বুদ্ধপূজা করল। যার ফলে ভবিষ্যৎ জন্মে সে সর্বাসক্তি ক্ষয় সাধন করে সর্বজ্ঞতা অর্জন করে বুদ্ধত্ব লাভ করবেন। এটাই মালীর চরম মূল্য প্রাপ্তি। একটি ফুল দান দ্বারা তার ফলশ্রুতি স্বরূপ হাজার ফুল লাভের কথা। বস্তু দানে বস্তু লাভ কর্মতত্ত্বের স্বাভাবিক বিধান। কিন্তু দাতার চিত্ত ক্রিয়ায় তথাগত বুদ্ধের প্রতি এত মহৎ অতলান্ত গভীর শ্রদ্ধার আবেগ কায়মনো বাক্যের অনুশীলনজনিত শক্তিশালী পুণ্য সংস্কার উৎসারিত হল। পরমার্থ জ্ঞান লাভের হেতু সম্পদ লাভ হল। এটা 'শ্রেষ্ঠভিক্ষা' কবিতার সাথে তুলনীয়। এখানে এক মহিলা তার জীবনের একমাত্র সম্পদ পরণের একখানি জীর্ণ শীর্ণ বস্ত্র প্রবল প্রবৃত্তিতে উলংগ হয়ে ত্যাগ করায় পরমার্থ সত্যের অধিকারিণী হলেন।

কবিগুরু এই কবিতায় তথাগতের অমৃতবাণী আনন্দঘন মূর্তি এবং করুণার সুধাহাস্য জ্যোতি জীবন্ত করে তুলেছেন। কুশলাকুশল কর্মের হেতু প্রত্যয় প্রদর্শন করেছেন। চিত্তের গতি প্রকৃতি নিয়ে দান। দান কখনো বিত্ত প্রধান নহে, দান চিত্ত প্রধান। বর্তমান যুগে হীনযান মহাযান অধ্যুষিত বৌদ্ধ প্রধান দেশে শত শত বছর ব্যাপী বিভিন্ন আকারের বুদ্ধ বিগ্রহ নির্মিত হয়ে আসছে। এখন বৌদ্ধ জগতে পরিদৃষ্ট হয়, প্রত্যেক বুদ্ধ বিগ্রহের মস্তকোপরি একটি পদ্ম ফুলের চিহ্ন। মালীর গভীর শ্রদ্ধা প্রদত্ত পদ্ম ফুলটি চক্রাকার ধারণ পূর্বক বুদ্ধের মস্তকোপরি প্রতিষ্ঠিত হওয়া একটা অলৌকিক ঘটনা। সম্ভবতঃ এই পদ্ম ফুল চিহ্নটি বক্ষ্যমান কাহিনীর মূর্ত প্রতীক।

অভিসার

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা থেকে উপকরণ গ্রহণ করে 'অভিসার' কবিতা রচনা করেছেন। এই কবিতার মধ্যে দুইটি দিগ্‌দর্শন আছে। একটি হচ্ছে নগরের নটীদের রূপচর্চা, দেহ-লাবণ্য ও কামনা বাসনার বহ্নিদাহে জীবনোৎসর্গ। অন্যদিকে ভোগবিমুখ বৌদ্ধ ভিক্ষুর দিব্য-কান্তি ক্ষমায় করুণায় কল্যাণ সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করে আর্ত দুঃস্থ মানব কল্যাণে আত্ম-নিয়োগ অর্থাৎ ভোগ ও ত্যাগ প্রবৃত্তির পাশাপাশি যুদ্ধ। পরিশেষে সত্যের জয়, অসত্যের বা মিথ্যার পরিহানি।

বোধিসত্ত্ব কল্পলতা অবদানে সন্ন্যাসী উপগুপ্ত ও বারবণিতা বাসবদত্তার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এটার রচনাকাল একাদশ শতক। রচয়িতা কাশ্মীরীয় কবি ক্ষেমেন্দ্র ব্যাসদেব। এটার অতি সংক্ষিপ্ত কাহিনী এরূপঃ-

মথুরা নিবাসী গুপ্তনামক পিতা তাঁর ছেলে উপগুপ্তকে সোনাবাসী নামক গুরুর নিকট উৎসর্গ করে দান দিলেন। সোনাবাসীর প্রতি উপগুপ্তের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। বাসবদত্তা নামে এক বারবণিতা উপগুপ্তের অনিন্দ্যসুন্দর রূপ-লাবণ্য দর্শন করে রূপজ মোহে মুগ্ধ হন। বাসবদত্তা উপগুপ্তকে তার বিলাস ভবনে যাওয়ার জন্য আহবান জানাল। মথুরাপুরীর যৌবন মদমত্তা বাসবদত্তা যখন সন্ন্যাসী উপগুপ্তকে তার বিলাসকুঞ্জে কামনা করেছিল তখন সন্ন্যাসী বললেনঃ

এখনো আমার সময় হয়নি
যেথায় চলেছ যাও তুমি ধনী
সময় যেদিন আসিবে আপনি
যাইব তোমার কুঞ্জে।

ইতিমধ্যে সন্ন্যাসী উপগুপ্ত সাধনা প্রভাবে কামক্রোধাদি সমস্ত রিপু জয় করে অর্হত্ব ফল লাভ করলেন। তাঁর জীবনে তথাগত বুদ্ধের ন্যায় জ্যোতির্ময় আকৃতি নেমে আসল। অনিন্দ্যসুন্দর আকৃতি প্রস্ফুটিত হল। তিনি তখন অবিদ্যা মোহ সর্বশক্তির উর্দ্ধে।

কিছুদিন পর বাসবদত্তা তার এক উপপতিকে বিষপানে হত্যা করল। তার শাস্তি স্বরূপ কঠোর নির্যাতনে তাকে হত্যা করার আদেশ জারী হল। ঘাতক বাসবদত্তার নাক, কান, চুল কাটল এবং বিবস্ত্র বিকলাংগ করে নিদারুণ কশাঘাতে জর্জরিত অবস্থায় পথিপার্শ্বে ফেলে গেল। এহেন বিপদ মুহূর্তে পূত চরিত্র সন্ন্যাসী উপগুপ্ত বাসবদত্তার সন্নিকটে হাজির হলেন। সন্ন্যাসী আপন নীতিধর্মানুসারে অনেক উপদেশ দানে কিছুটা সান্ত্বনা দিলেন। উপগুপ্ত আর্ত নারীর শির যখন আপন অঙ্কে তুলে নিয়ে সেবা শুশ্রূষা দ্বারা সুস্থ করে তুললেন, তখন বাসবদত্তা জীবন লাভ করে ত্রাণকর্তার দিকে করুণ আঁখি তুলে বললঃ

কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়
শুধাইল নারী। সন্ন্যাসী কয়
আজি রজনীতে হয়েছে সময়
এসেছি বাসবদত্তা।

কবিগুরুর অভিসার কবিতায় বৌদ্ধ ভিক্ষুর চরিত্রে করুণা, ত্যাগ, নির্বেদ বৈরাগ্যের আদর্শ অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে। কবিগুরু বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর অনাবিল আধ্যাত্মিক পবিত্র চরিত্রটিকে অভাবনীয় মহিমায় প্রকট করে তুললেন। সন্ন্যাসী উপগুপ্ত ও বাসবদত্তা উভয়ই বাসনা উত্তীর্ণ। উপগুপ্ত সাধনাপ্রভাবে বাসনা-কামনাজনিত প্রবৃত্তি রাজ্য ত্যাগে নিবৃত্তি রাজ্যে উত্তীর্ণ। আর বাসবদত্তা নিদারুণ কশাঘাতে বিকলাংগ জর্জরিত দেহে কামনা নিবৃত্তিতে উত্তীর্ণ। উভয়ই এখন আসক্তিমুক্ত পূত পবিত্র।

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অবদান শতকের বস্ত্রাবদান কাহিনী অবলম্বনে শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা কবিতা লিখেছেন। কবিতায় দানের মহিমা কীর্তিত। তথাগত বুদ্ধ দশ পারমিতা পূরণ করে যে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন, তন্মধ্যে দানপারমিতা সর্বপ্রথম। বস্তুত দান বা ত্যাগই সকল সাধনার উৎস। দান সর্বদা চিত্তপ্রধান। দান কখনো বিত্ত প্রধান নয়। দানের মহত্ত্ব চিত্তপ্রবৃত্তির উপর নির্ভরশীল।

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষার কাহিনী নিম্নরূপঃ

তথাগত বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। এমনসময় শ্রাবস্তীতে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হল। দুর্ভিক্ষ নিরসনকল্পে বুদ্ধ অনাথপিণ্ডদ শ্রেষ্ঠী তথা ভিক্ষুদিগকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে দুর্ভিক্ষ নিরসনের আদেশ দিলেন। অনাথপিণ্ডদ রাজার থেকে সর্বসাধারণের হিতার্থে ভিক্ষা সংগ্রহের অনুমতি প্রাপ্ত হলেন। শ্রেষ্ঠী অনাথপিন্ডদসহ ভিক্ষুরা ভিক্ষা সংগ্রহে বিচরণ আরম্ভ করলে যার যার সাধ্যমত দান দিতে আরম্ভ করল।ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী, বণিকগণ বহুমূল্য সোনা রূপা অলংকারপত্র, হাতের বালা, গলার হার মাথার মণি দান দিতে লাগল। ধনীর উদ্বৃত্ত বিপুল সম্পদ থেকে দান করা সহজ। কিন্তু নিঃস্ব অবস্থায় যার কোন সম্পদ বলতে কিছু নেই, সেখান থেকে কিছু দান করা বড় কঠিন। শাস্ত্রে একটা কথা আছে- 'দানঞ্চ যুদ্ধং চ সমানমাহু। দান ও যুদ্ধ এক সমতুল্য, অর্থাৎ অসীম শক্তি সম্পন্ন অল্প সংখ্যক যোদ্ধা ক্ষুদ্র শক্তিসম্পন্ন বৃহত্তর সংখ্যক সৈন্যবাহিনীকে জয় করতে সক্ষম। তদ্রূপ অতি ক্ষুদ্র বস্তু ত্যাগে যদি দাতার চিত্তপ্রবৃত্তি অতি মহৎ হয়, শ্রদ্ধা যদি গভীর অতল স্পর্শী হয়, তবে বিরাট বিত্ত ত্যাগ অপেক্ষা ক্ষুদ্র বস্তু ত্যাগের মহিমা অধিকতর শক্তিশালী।

অনাথপিণ্ডদ প্রভৃতি ভিক্ষা সংগ্রহকারীরা যখন গহন গভীর এক অরণ্যের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন অরণ্য থেকে একখানি জীর্ণ বস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয়ে তাঁদের সম্মুখে পতিত হল। অথচ দাতা কারো দৃষ্টি গোচরে এলোনা। অনাথপিণ্ডদ বস্ত্রখানি শিরোধার্য করে করুণাময় বুদ্ধের সম্মুখে পৌছলেন। তথাগত বুদ্ধ দিব্যদৃষ্টিতে দেখলেন অরণ্যে ছিল এক দীন দরিদ্রা নারী। তার জীবনের একমাত্র সম্বল ছিল এই পরিধেয় বস্ত্রখানি। একদিকে করুণাঘন বুদ্ধের

আবেদন, অনাথপিণ্ডদ ও ভিক্ষুদের ভিক্ষা সংগ্রহে বিচরণ, তাতে আপন উদ্বেলিত লোভমুক্ত চিত্তে গভীর শ্রদ্ধার আবেগে এবং দেশপ্রেমের গভীর অতলান্ত তাড়নায় দরিদ্রা নারী অস্থির হয়ে পড়ল। তদ্ধেতু লজ্জা নিবারণের শেষ সম্বলটুকু ঝোপ জংগলে দেহ আড়াল করে উলংগ হয়ে দেশের কল্যাণে মানব সেবায় বস্ত্রখানি দান করে দিল। ধর্মপূণ্যাকাঙ্ক্ষা ও দেশপ্রেম তাকে দিগম্বরী করে ছাড়ল। দেশের ধনিক বণিক শ্রেষ্ঠীর অজস্র দান বুদ্ধের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারল না। আকর্ষণ করল দরিদ্রা নারীর জীর্ণ শীর্ণ বস্ত্রখানি। এই দান বৌদ্ধ শাস্ত্রে চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। স্বয়ং বুদ্ধ বাণীতে তার ভূয়সী প্রশংসা বর্ণিত হল। এই দানের তুলনা নেই। তাই কবীন্দ্রের কবিত্বে প্রতিধ্বনি উঠলঃ

অরণ্য আড়ালে রহি কোন মতে
একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে
বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে ভূতলে।

বুদ্ধের নির্দেশে অতঃপর সেই দরিদ্রা রমণীকে নানা পোশাকে ভূষিত করে বুদ্ধ সকাশে হাজির করা হল। করুণার মংগল প্রতীক বুদ্ধ তার দানচিত্তের মহিমা বর্ণনা করলেন। সাধারণ মানুষের জীবনে সুদুর্লভ বিষয় বুদ্ধ দর্শন, বুদ্ধের মুখের ধর্ম শ্রবণ অতিশয় পুণ্যকর্ম। তাতে ঐ মহিলা জীবন ও জগতের অসার অনিত্যতা ও ব্যাপকতা উপলব্ধি করে পরম জ্ঞান লাভ করলেন। একখানি জীর্ণ বস্ত্র দান উপলক্ষে বুদ্ধদর্শন, বুদ্ধের মুখে ধর্ম শ্রবণ ও পরমার্থজ্ঞান লাভের উৎস, হেতু সম্পদ এবং উপনিশ্রয় সম্পদ। তাই রবীন্দ্রসাহিত্যে বৌদ্ধসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ মহিমা কীর্তিত হল।

সামান্য ক্ষতি

এই কবিতাটি লেখার সময় শ্যামাবতী কাহিনী থেকে কবি উপাদান গ্রহণ করেছেন। প্রত্যেক কবিতার পেছনে যে পটভূমিকা বিদ্যমান থাকে যদি তা জানা না থাকে তাহলে কবিতার মর্মার্থ পুরাপুরি বোধগম্যে আসে না। তাই প্রত্যেক কবিতার পটভূমিকা জানা একান্ত প্রয়োজন। সামান্য ক্ষতি কবিতার ঐতিহাসিক বিবরণটি নিম্নরূপঃ

বারানসীরাজ ব্রহ্মদত্তের পাঁচশত রাণী ছিলেন। একদিন তারা প্রমোদকেলি করার উদ্দেশ্যে এক উদ্যানে গিয়েছিলেন। সমীপবর্তী এক নদীতে পরম উল্লাসে স্নান করে অসহ্য ঠান্ডা অনুভব করছিলেন তারা। নদীর তীরে ছিল এক ঋষির পর্ণ কুটির, তদ্দর্শনে রাজার অগ্রমহিষী তার সহচরীকে ঋষির পর্ণকুটিরে অগ্নি সংযোগ করতে আদেশ দিলেন। যথাজ্ঞা সহচরী ঋষির পর্ণ কুটিরে অগ্নি সংযোগ করল। ঋষির পর্ণ কুটির যখন দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগলো, তাতে অগ্রমহিষী ও তার সহচরীবৃন্দ অগ্নিতাপ গ্রহণ পূর্বক প্রচণ্ড শীতের প্রকোপ কিছুটা লাঘব করলেন। এদিকে ঋষির পর্ণ কুটিরের আগুন ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে সমগ্র

গ্রাম ভস্মীভূত হয়ে গেল। গ্রামে হাহাকার রব, আর্তনাদ ধ্বনি। অগ্রমহিষী তাতে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তাঁর কাছে এই অগ্নিকাণ্ড সামান্য ক্ষতি বলেই প্রতীয়মান হল। যেহেতু মহারাণীর বিপুল রাজকীয় সম্পদের মধ্যে এটা এমন কি ? এই সম্পর্কে বলাবলি করতে করতে রাজার কর্ণ-গোচরে এলে, স্বয়ং রাজাই রাণীর বিচার করলেন। এ অপরাধের জন্য শাস্তি দিলেন। রাণীর রাজকীয় রাজসজ্জা, স্বর্ণ-রৌপ্য হীরা মাণিক্য খচিত অলংকারপত্র সব খুলে ফেলে পথের ভিখারী বেশ পরিহিতা করে ছেড়ে দিলেন। কবিগুরু রাজার প্রকৃষ্ট অনুভূতি এবং গাঢ় সন্নিবদ্ধ রূপ লক্ষ্য করে বললেনঃ

পথে লয়ে তারে কহিলেন রাজা
মাগিবে দুয়ারে দুয়ারে
এক প্রহরের লীলায় তোমার
যে ক'টি কুটির হল ছারখার
যত দিনে পারো সে ক'টি আবার
গড়ে দিতে হবে তোমারে।।

বাড়ী ঘর ওগ্রাম পোড়ানোকে রাণী ক্ষতিকারক বলে মনে করেননি। অনুতপ্ত হননি। একে সামান্য ক্ষতি মনে করেছেন। কিন্তু রাজা এই অগ্নিকাণ্ড অবহেলা করতে পারলেন না। অগ্রমহির্ষীকে ক্ষমা করলেন না। এই গণাপরাধকে অমার্জনীয় বলে আপোস করলেন না। রাজা ইচ্ছা করলে প্রচুর অর্থব্যয়ে প্রজাদের ভস্মীভূত গৃহগুলি নির্মাণ করে দিতে পারতেন। কিন্তু তা না করে দীন দরিদ্রের দারুণ দুঃখ দুদর্শার অনুভূতি রাণীর অন্তরে জাগাবার জন্য কঠোর শাস্তি বিধানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাজা মহারাণীকে পথে নামিয়ে এমন শাস্তি প্রদান করলেন যা জগতের ইতিহাসে অতি বিরল। এই ঘটনায় রাজা গণতান্ত্রিক অনুভূতিতে প্রজা বাৎসল্যের গুরুত্ব আরোপ করেন। যেই জনগণকে উপলক্ষ্য করে বোধিসত্ত্বগণ পারমিতা পরিপূরণ করেন, যে জনমানবকে হেতু প্রত্যয় করে বুদ্ধগণ বুদ্ধত্ব লাভ করেন, সেই জনজীবনে সংঘটিত এই বীভৎস ঘটনাকে রাজা হেয় জ্ঞান করেননি। তাই কবিগুরুর অন্তরে নৈতিক জ্ঞান ও মানবিকতা প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাণীর চক্ষে রাজকীয় প্রতুল সম্পদের তুলনায় এটা সামান্য বলে ধারণা হলেও জগতে সে সামান্য থেকে অসামান্যের সৃষ্টি হয়, তাই কবিগুরু অনুলোম পর্যায়েই কবিতার নামকরণ করলেন সামান্য ক্ষতি। কবিদের স্বভাব-সিদ্ধ নীতি হচ্ছে পৃথিবীর এক কোণের কথা তার বিপরীত কোণে গিয়ে বলা।

মস্তক বিক্রয়

এই কবিতাটি মহাবস্তুঅবদান অবলম্বনে রচিত। মূলতঃ এটার মূল ভিত্তি হল অজ্ঞাত কৌণ্ডিন্য জাতক। অতি সংক্ষেপে কাহিনীটি নিম্নরূপঃ

কাশী ও কোশল পাশাপাশি রাজ্য। কোশল রাজ্য অপেক্ষাকৃত ছোট রাজ্য হলেও রাজা ছিলেন ধর্মপ্রাণ প্রজাবৎসল। মানবিক মহিমায় গুণান্বিত। কাশীরাজ কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে কোশল রাজ্য কাশী রাজ্যের হস্তগত হল। কোশল রাজ বিজিত রাজ্য ত্যাগ করে স্ত্রী ও পুত্রসহ পলাতক জীবন যাপন করছেন। এমন সময় কোশলরাজ জানতে পারলেন যে, কাশীরাজ ঘোষণা করেছেন, যে কোশল রাজা-রাণীকে ধরে দিতে পারবে তাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দেওয়া হবে। একদিন এক পথিকের সংগে কোশল রাজার সাক্ষাৎ ঘটল এক বনের মধ্যে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন-এ পথিক সর্বস্বহারা। সাহায্যপ্রার্থী হয়ে কোশল রাজের সন্ধানে চলছে। রাজ্যহারা পথের ভিখারী হয়েও দানশীল জনদরদী কোশল রাজ কল্পনা করলেন-অর্থ লাভের যোগ্য স্থানে সর্বহারা পথিককে নিয়ে যাবেন কাশী রাজ দরবারে। তিনি জানেন যে ধরা দিলেই রাজা-রাণীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে প্রাণ-ধন পুত্র দীর্ঘায়ু কুমারকে ত্যাগ করে আর্তসেবার চরম দৃষ্টান্তে কোশলরাজ রাণীকেও অজ্ঞাত পরিচিত পথিককে সাথে করে কাশী রাজার রাজ-দরবারে হাজির হলেন এবং বললেন আমি সেই কোশল রাজ, এ-সেই কোশল রাণী। আমাকে ধরে যে দেবে, তাকে যে একশত স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দানের ঘোষণা করেছ, সেই ঘোষিত মুদ্রা পুরস্কার এই পথিকের প্রাপ্য। তাকে ঘোষিত মুদ্রা দিয়ে বিদায় কর। তখন কাশীর রাজা পথিককে স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বিদায় করলেন এবং কোশল রাজ ও রাণীকে কারাগারে আবদ্ধ করলেন। কিছুদিন পর কাশীর রাজা ভাবলেন শত্রুকে জিন্দা রাখতে নেই। শত্রুকে নিহত করা রাজধর্ম। তদনুযায়ী কাশীরাজ একদিন কোশলরাজ ও রাণীকে হত্যা করার আদেশ জারী করলেন এবং দিন তারিখ নির্ধারণ করে দিলেন। বধকগণ নির্ধারিত দিন তারিখে যথাসময় কোশলরাজ ও রাণীকে বধ্যভূমিতে হাজির করল। এই খবরে কাশী ও কোশল রাজ্যে শোকছায়া নেমে এলো। সকলের মুখে হায় হায় রব। বধ্যভূমিতে লোকে লোকারণ্য। জনতার সাথে কোশলরাজ পুত্র দীর্ঘায়ু কুমারও বধ্যভূমির যুপকাষ্ঠের সন্নিকটে গিয়ে দাঁড়াল। পিতা-মাতার সাথে মুখামুখি সাক্ষাত হল। কিন্তু পরিচয় কাকেও কেউ দিল না। দিলে তো পুত্রের মৃত্যুও সুনিশ্চিত। কোশল রাজা ও রাণী যখন যুপকাষ্ঠে পদক্ষেপ করছিলেন, তখন পুত্রকে লক্ষ্য করে কোশল রাজার মুখ থেকে কয়েকটি শব্দ স্ফূরিত হয়ে এলো, "শত্রুর স্মৃতি মনে গেঁথে রেখ না, শত্রুতার প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করো না"। শব্দগুলো কে কাকে উপলক্ষ্য করে বলল-কেউ বুঝতে পারল না। যথাসময় কোশল রাজা-রাণীর বধকর্ম সম্পাদিত হয়ে গেল।

অতঃপর দীর্ঘায়ু কুমার ছদ্মবেশে রাজ্যের মধ্যে ঘুরে ফিরে রইল। তার একটা ভারী চমৎকার অভ্যাস ছিল। সে বাঁশী বাজাতে অত্যন্ত নিপুন। তার বংশী লহরীতে সকলে মুগ্ধ।

একদিন কাশী রাজার রাজহস্তীর মাহুতের সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটল। মাহুত তাকে মাহুত খানায় নিয়ে গেল। তার বংশীধ্বনিতে সকলে মোহিত হয়ে উঠল। কাশীরাজ এই সংবাদ পেয়ে ছেলেটিকে রাজদরবারে হাজির করার জন্য আদেশ দিলেন। ছেলেটি হাজির হলে কাশীরাজ তার বংশী ধ্বনিতে মোহিত হয়ে তাকে আর ছাড়লেন না। রাজ অন্তপুরীতে রেখে দিলেন। রাজা সকাল-বিকাল তার বংশীবাদন শুনে আহ্লাদিত হন। তখন থেকে দীর্ঘায়ু কুমার রাজার নিত্য সহচর। রাজা যেখানে যান, দীর্ঘায়ুকে যুবরাজ সজ্জায় সজ্জিত করে সাথে নিয়ে যান।

একদিন কাশীরাজ দীর্ঘায়ু কুমারকে যুবরাজ সজ্জায় এবং অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত করে বনে মৃগয়ায় গমন করলেন। ঘন্টার পর ঘন্টা চেষ্টা করেও অরণ্যে মৃগের সন্ধান পেলেন না। এজন্য রাজা অত্যধিক ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তন্দ্রাবেশে অভিভূত। মহারণ্যে রাজশয্যা কোথায় পাবেন। নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন দীর্ঘায়ু কুমারের কোলে। রাজা দিব্যি আরামে ঘুমাচ্ছেন। এমন সময় দীর্ঘায়ু কুমারের চিন্তার উদ্রেক হল,-হায়রে দুনিয়া! এই রাজা আমার পিতৃরাজ্য আত্মসাৎ করলেন। চোখের সামনে আমার পিতা-মাতাকে হত্যা করলেন। সেই রাজা আজ আমার কোলে ঘুমাচ্ছেন। অস্ত্রতো আমার হাতেই আছে। এখনই রাজাকে হত্যা করে ফেলব। এই বলে রোষভরে কোষ থেকে অসি বের করল। তখনই মনে পড়ল-পিতৃ উপদেশ- "শত্রুতার স্মৃতি মনে গেঁথে রেখ না, শত্রুতার প্রতিশোধ জীবনে নেওয়ার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করো না"। ইহাতে দীর্ঘায়ু কুমারের অন্তরে দ্বিমুখী দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হল। একদিকে পিত্রোপদেশ, অন্যদিকে কাশী রাজের গলদেশে অসি চালাবার ঔদ্ধত্য। দ্বিমুখী দ্বিধাদ্বন্দ্বে পরিশেষে পিত্রোপদেশ জয়লাভ করল। এমনসময় কাশীরাজ হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে কাঁপতে আরম্ভ করলেন। কুমার জিজ্ঞেস করল- মহারাজ কাঁপছেন কেন? কাশীরাজ বললেন-বৎস! আমি স্বপ্নে দেখলাম- কোশলরাজপুত্র দীর্ঘায়ু কুমার আমার গলায় অসি প্রয়োগ করছে। কুমার বলল,- না মহারাজ। এই মহারণ্যে কোথায় সেই কোশলরাজ পুত্র দীর্ঘায়ু কুমার। আপনার স্বপ্ন অলীক। আপনি নিশ্চিন্ত হউন। এই বলে মৃগয়ায় আর অগ্রসর না হয়ে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

অতঃপর যথারীতি চলল-কুমারের ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনীর সুর লহরীতে বংশীবাদন। রাজা বেশ আমোদ প্রমোদে আছেন। হঠাৎ একদিন কুমার বলল,- মহারাজ। আজ আপনাকে একটি সত্য কথা বলব। কথা হচ্ছে এই-ঐদিন অরণ্যে আমার কোলে যখন ঘুমাচ্ছিলেন তখন আপনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন,- তা একান্ত সত্য। আমিই সেই কোশলরাজ পুত্র দীর্ঘায়ু কুমার। আমি শত্রুতার প্রতিশোধ নেওয়ার লক্ষ্যে আপনার গলায় অসি চালাতে উদ্ধত হয়েছিলাম। কিন্তু বধ্যভূমিতে বধক্রিয়ার প্রাক্কালে পিতার অমূল্য উপদেশ স্মরণ করে আমি ক্ষান্ত হয়ে গিয়েছি। এই বলে কুমার আদ্যোপান্ত সব ঘটনা সরল চিত্তে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করল। তচ্ছ্রবণে কাশী রাজার চক্ষু স্থির, রাজা অতীব বিস্ময়াভিভূত। কাশীরাজ্যে ও কোশলরাজ্যে এই বিচিত্র ঘটনার করুণ কাহিনীর সমাচার রাষ্ট্র হয়ে পড়ল। রাজা-প্রজা সবাই অবাক হয়ে

গেলেন। এবার কাশীরাজার শুভ বুদ্ধির উদয় হল। তিনি গভীর চিন্তার সহিত স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। রাজ্যাভিষেকের দিন তারিখ নির্ধারণ করলেন। মহাসমারোহের সহিত আনুষ্ঠানিকভাবে দীর্ঘায়ু কুমারকে সিংহাসনে উপবেশন করালেন এবং আপন রাজমুকুট দীর্ঘায়ু কুমারের মস্তকে পরিয়ে দিলেন। সাথে সাথে আপন কন্যাকে কুমারের হস্তে সমর্পণ করে বললেন-বৎস! আজ তুমি কাশী ও কোশল রাজ্যের অধীশ্বর। আজ তুমি শত্রুপুত্র নও, তুমি আমার পুত্র।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বিশাল সৃষ্টি এই আশ্চর্যজনক কাহিনীকে অবলম্বন করে বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব ত্যাগ, তিতিক্ষা, মৈত্রী, করুণা, সহিষ্ণুতার আদর্শকে প্রতোদদণ্ডের ন্যায় তুলে ধরলেন। তাঁর কবিতায় উভয় রাজাকে মহত্ত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিয়ে উভয়কেই উন্নত মহিমা প্রদান করলেন। দীর্ঘায়ু কুমার পিতার সর্বশক্তি সংস্কার জীবনে উপলব্ধি ও মূল্যায়িত করায় এবং পিতার উপদেশ শিরোধার্য করায় পরিণতিতে মহান সৌভাগ্যের অধিকারী হয়ে গেলেন।

প্রার্থনা

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ পালি সাহিত্য পাঠ করে তথাগত বুদ্ধের প্রতি তাঁর অনুভূতি, উপলব্ধি, চিন্তা চেতনা এবং সে যুগের শিল্পকলা বিষয়ক কয়েকটি মূল্যবান কবিতা লিখেছেন। তন্মধ্যে প্রার্থনা কবিতাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এটা লিখেছেন ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে।

অনেক লেখক বলেন- 'বৌদ্ধধর্মে প্রার্থনা নেই', যেহেতু বৌদ্ধধর্ম কর্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ জগৎ কর্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সুখ-দুঃখ ভোগাদি জীবনের সবকিছু কর্মের উপর নির্ভর। 'বৌদ্ধধর্মে প্রার্থনা নেই'-একথা সর্বৈব সত্য নয়। বস্তুতঃ বৌদ্ধআদর্শে পার্থিব কোন সম্পদের জন্য কোনরূপ প্রার্থনা নেই। যদি থাকেওবা তা নিতান্ত গৌণ। অপার্থিব, আধ্যাত্মিক কিংবা পারমার্থিক সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা বৌদ্ধ ধর্মের বা শাস্ত্রের সর্বত্র বিরাজমান। পুত্রং দেহি, ধনং দেহি, যশং দেহি বলে কোন সর্বশক্তিধরসমীপে আরাধনা নেই। এটা কোন ইচ্ছাময় এর নিকট নির্ভরশীল নয়। এ জগতে সর্বজীবের মধ্যে যে কামনা বাসনার তাড়না, হিংসাক্রোধের উত্তেজনা, ভাবের উন্মাদনা, অভাবের যাতনা, অহংকার, অবিদ্যা, মোহ, ঈর্ষা, মাৎসর্য, বিদ্বেষ ইত্যাদি রিপু নিয়ে জীব জগতকে নির্দয় নির্যাতনে জর্জরিত করে রাখে তার থেকে রক্ষার জন্য জীবনকে নিষ্কলুষ করে পরমা শান্তির কামনায় প্রার্থনা আছে সর্বত্র। ও থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় বুদ্ধের ধর্মে উপদেশ বাণী ও সাধনার কথা আছে। আসক্তির আগ্রাসী অবিদ্যা মোহ যা জীবজগতকে লাঞ্ছিত করে রেখেছে, তার থেকে পরিত্রাণ বুদ্ধের ধর্মাদর্শ। রিপুঞ্জয় বুদ্ধের নির্বাণ মুক্তি, বুদ্ধের নীতি আদর্শ ও জীব জগতের দুঃখ দুর্দশার প্রতি লক্ষ্য করে কবিগুরু কবিতা লিখেছেনঃ

কামনায় বাসনায় দেশে দেশে যুগে যুগান্তরে
নিরন্তর নিদারুণ দ্বন্দ্ব যবে দেখি ঘরে ঘরে
প্রহরে প্রহরে, দেখি অন্ধ মোহ দুরন্ত প্রয়াসে
বুভুক্ষার বহ্নি দিয়ে ভস্মীভূত করে অনায়াসে
নিঃসহায় দুর্ভাগার সকরুণ সকল প্রত্যাশা
জীবনের সকল সম্বল; দুঃখীর আশ্রয় বাসা।

বুদ্ধ ত্রিকালজ্ঞ, বুদ্ধ কোন কালের, দেশের কিংবা পাত্র বিশেষের সীমায় আবদ্ধ নন। তিনি সর্বকালের সর্বজনের সমগ্র বিশ্বের। বুদ্ধের এই অসীমতা কবিচিত্তে বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়েছে। তাই কবি বলেছেনঃ

বিসর্জিয়া সর্ব আপনার
বর্তমান কাল হতে নিষ্ক্রমিলা নিত্যকাল মাঝে"।

তিনি যদি ব্যক্তিগত জীবনের মুক্তি চাইতেন, সুমেধ তাপস জন্মেই মুক্তি লাভ করে যেতে পারতেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন জীবমাত্রই নিজ নিজ অহমিকার গণ্ডীতে আবদ্ধ। তাঁর সাধনায় ছিল সমস্ত জীবকে তার 'অহমিকা বন্দীশালা' হতে উদ্ধার করা, তাই কবি বলেছেন-

"অনন্ত তপস্যা বহি মানুষের উদ্ধারের কাজে অহমিকা বন্দীশালা হতে"

শুধু অহমিকায় নয়, জীব লোভ দ্বেষ মোহাদি সর্ব ক্লেশে আবদ্ধ। ক্লেশ-ত্যাগই চরম মুক্তি। কাম-ক্রোধ সর্ব ক্লেশ ধ্বংসেই বুদ্ধের বুদ্ধত্ব। তাই কবি বলেছেনঃ

ভগবান বুদ্ধ তুমি
নির্দয় এ লোকালয়, এ ক্ষেত্রেই তব জন্মভূমি।

বৌদ্ধদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে, সাধন সাগরে ডুব দেবার প্রাক্কালে, নিত্য নৈমিত্তিক বন্দনাদিতে শুধু ক্লেশ নিবৃতির প্রার্থনা আছে। জাগতিক কোন সম্পদের প্রার্থনা নেই। যেমনঃ

'সব্ব দুক্‌খ নিস্‌সরনা নিব্বান সচ্ছি করণত্থায়।

জীবনের সকল দুঃখের অবসান ঘটিয়ে চির শান্তি নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার লক্ষ্যে প্রার্থনা থাকে সর্বক্ষণ সর্বক্ষেত্রে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধপ্রাণ সকল সাহিত্য ক্ষেত্রেই ক্লেশ ধ্বংসের ও দুঃখমুক্তির আরাধনায় প্রোজ্জ্বল। মৃত্তিকাময় পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল ও জলের ন্যায় উপেক্ষাপরায়ণ তথাগত বুদ্ধের জীবনাদর্শ থেকে বিচ্যুত আমরা উপযুক্ত শক্তির দৈন্যে ক্ষমাশূন্য হয়ে পড়েছি। ক্ষমা ও উপেক্ষার মাধুর্য আমাদের চিত্তগর্ভে শূন্যতা লাভ করেছে। কাম-ক্রোধাদির এরূপ অত্যুগ্র সংসারলীলা বিন্দুমাত্র বিচিত্র নয়। ইহা খুবই স্বাভাবিক। এ জগতে কাম-বাসনার তাড়নায়, হিংসা-ক্রোধের উত্তেজনায় ছুরিকা দ্বারা নিজকে নিজে আঘাত করে, আহার ত্যাগ করে উপবাস করে, কেউ ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলে, কেউ উচ্চস্থান থেকে নিজকে নিম্ন প্রপাতে নিক্ষেপ করে, গাড়ীর নীচে চাপা খেয়ে মরে, অকূল পাথারে ঝাঁপ

দেয়, কেউ বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। কাম-ক্রোধাদির অধীনতা হেতু হতভাগ্য জীব যদি জগতের সর্বাধিক প্রিয় আপনাকে এভাবে আঘাত হানতে পারে, তবে স্বার্থের অন্ধতায় অপরকে আঘাত হানাতো সচরাচর ও স্বাভাবিক ঘটনা। লোভ-দ্বেষের তাড়নায় মানুষ কি-না করতে পারে? সাধারণতঃ যাকে বলা হয়-শত্রু, তাকেও বৌদ্ধধর্মের উচ্চাঙ্গের নৈতিকবোধে ও যুক্তির প্রভাবে বলা হয়েছে পরম মিত্র। তথাগত বুদ্ধের নীতিধর্মে শত্রু বলতে কেউ নেই, জগৎ মিত্রে পরিপূর্ণ।

সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর; অহিংসা, বিশ্বমানবতা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও করুণার মূর্ত প্রতীক যিনি ছিলেন, যাঁকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বলে জীবনের সর্বশক্তিতে স্বীকার করেছেন তিনি মানবতার অতি উচ্চাংগের নৈতিকবোধের প্রেরণাতেই নীতি আদর্শের প্রচার প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন, কোন দেশ, কাল পাত্রের বিশেষ পরিস্থিতি লক্ষ্য করে উপদেশ দিয়ে যাননি। পরিস্থিতি যা ছিল, এখনো তা আছে এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। ব্যক্তিগত বা সামাজিক ভাবে কে কার জন্য কি করতে পারে? তথাগত জগতজোড়া হিংসা-হত্যা, অত্যাচার অবিচারের কি সমাধান করতে পেরেছেন? আপন আপন লোভদ্বেষ মোহমূলক মনোবিকার নিরসন করে বিশ্ব মানবতাবোধের পূর্ণাংগ উপলব্ধি করেছেন এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন মাত্র। বাহ্যিক কামিনী কাঞ্চন মূলক অন্যায় অত্যাচার বিশ্ববিস্তৃত। এটা জয় করার সাধ্য কার? তবে আপনার অন্তরস্থ সর্বপ্রকার শত্রু বিজিত হলে জগৎ যে শত্রু শূণ্য হয়ে যায়, এই আদর্শ প্রদর্শন করে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য শান্তিদেব সপ্তম শতকে তাঁর বোধিচর্যাবতার গ্রন্থে বলেছেনঃ

ভূমিং ছাদয়িতুং সর্বাং কৃতশ্চর্ম ভবিষ্যতি,
উপান চর্মমাত্রেন ছন্না ভবতি মেদিনী।।
বাহ্যাভাবা ময়া তদ্বচ্ছক্যা বারায়তুং ন হি,
স্বচিত্তং বারয়িস্‌সামি কিং সমান্যৈ র্নিবারিতৈঃ।।

সমগ্র জগৎ আচ্ছাদিত করার জন্য একখানি চর্মখন্ডের প্রয়োজন। কারণ জগৎ ধূলি-বালি, পাঁক-কাদা, গোঁজা-কন্টকে ভরপুর, লোকজনের চলাফেরার অসুবিধা, তার নিরসন প্রয়োজন। তাই বলে বিশ্বজোড়া বিশাল চর্ম পাওয়া কি সম্ভব? তা কখনো সম্ভব নয়। প্রতিকূল সকল বাহ্য বস্তুকে নিবারণ করার সামর্থ্য আমার কোথায় ? কাজেই আমার উপায় হচ্ছে আপন জুতা-রূপ চর্মে জগতের যতটুকু অংশ আবৃত হয়, এতেই মনে করতে হবে যে, আমি সমগ্র জগৎ আচ্ছন্ন করে ফেললাম। এটা অন্তরমুখী আত্মোপলব্ধির চরম নিদর্শন স্বরূপ। আমি কেন ? তথাগত বুদ্ধগণ কি জগৎজোড়া কাম-ক্রোধের তাড়না ও উত্তেজনা হত্যা করতে সক্ষম হয়েছেন? কেউ পারেননি। তবে আপন আপন তাড়না ও উত্তেজনামূলক মনোবিকার নিরসন করে জগতে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন।

জুতা আবিষ্কার

৭ম-৮ম শতকের কথা। প্রাচীন সমতট রাজ্যের লালমাই ময়নামতী অঞ্চলের বৌদ্ধরাজা ছিলেন ভবচাঁদ বা ভবচন্দ্র। তাঁর মন্ত্রী ছিলেন গবচন্দ্র রায়। তাঁদের সংক্ষিপ্ত প্রচলিত নাম ছিল হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী। তাঁদের অদ্ভুত জীবনের আজগুবি গল্প কাহিনী কুমিল্লা অঞ্চলের প্রাচীন লোকদের মুখে মুখে আজও আছে। এখনো বাংলাদেশে কারো জীবনে অন্তঃসারশূন্য ঢোসা বুদ্ধি বিবেচনা দেখলে লোকে বিদ্রূপ করে বলে হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সেই হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রীর হাস্যাস্পদ এক রূপক কাহিনী অবলম্বনে "জুতা আবিষ্কার" কবিতা লিখলেন ঊনবিংশ শতকে। কবিতাটি বৌদ্ধধর্মের মৌলিক আদর্শ সাধনার চরম পরিণতি-আত্মদর্শন, আত্ম-সমীক্ষণ, আত্মোপলব্ধি, আত্মসংযম, অথচ যা বহির্বিকাশে বিশ্বপ্রেম, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, ছবির প্রতিচ্ছবি, ধ্বনির প্রতিধ্বনি। জুতা আবিষ্কার কবিতার

বর্ণনায় আছে জগতকে ধূলিবালি শূন্য করা কোন উপায়েই সম্ভবপর নয়, যাতে পদযুগলে ধূলিবালি স্পর্শিত না হয়, আপন পদযুগলে জুতা পরিহিত হলেই জগতকে ধূলিবালি শূন্য করার উদ্দেশ্য সফল হয়। অসীম আকাশতুল্য অসংখ্য দুঃশীল দুর্জনে জগৎ পরিপূর্ণ, কয়জনকে সংশোধন বা বধ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে? এর তাৎপর্য এই-সাধনার প্রভাবে লোভ - দ্বেষ-মোহাদি অভ্যন্তরীণ সকল প্রকার শত্রু ধ্বংস করতে পারলেই বহিঃশত্রু শূন্য হয়ে যায়। যেহেতু অন্ত-শত্রুতাই বহিঃশত্রুতাসৃষ্টি করে। অন্তঃশত্রু ধ্বংস প্রাপ্ত হলে বহিঃশত্রু সম্পর্কে কল্পনা জাগবে কোথায়? এই যুক্তিও অতীব সংগত যে বহিঃশত্রুতা অপেক্ষা আপনার জীবনে অন্তঃশত্রুভাব অধিকতর মারাত্মক শত্রু, নিজেই নিজের পরম শত্রু। পক্ষান্তরে বিশ্বপ্রেম, মৈত্রী, করুণা, জীবে দয়া আপন জীবনে পরম কল্যাণ মিত্র।

যেতে নাহি দেব

বৌদ্ধদর্শন মতেঃ

অচ্ছেন্তি কালা তরযন্তি রত্তিয়ো
বযোগুণা অনুপব্বং জহন্তি,
এতং ভয়ং মরণে পেক্খমানো
পুঞ্ঞানি কয়িরাথ সুখবহানি।

কল্প, শতাব্দী, যুগ, বছর, মাস, পক্ষ, দিবা-রাত্রির আকারে কাল আপন গতিতে নীরবে নিস্তব্দে অবিরত প্রবাহিত হয়ে চলছে। কাল স্থির থাকে না। সাথে সাথে জীবনের বল, বীর্য, আয়ু, সংস্কার ক্রমান্বয়ে সবকিছু পরিত্যক্ত হয়ে থাকে। কাল সর্বক্ষণ প্রবহমান। কালের ন্যায় আকাশে বায়ু প্রবাহ, পাতালে জলপ্রবাহ, ভৌতিক দেহে তেজঃ প্রবাহ, অন্তরে চিত্ত প্রবাহ অবিরাম অবিশ্রাম ভাবে প্রবাহিত। এভাবে জগতের সবকিছু চলমান, সর্বক্ষণ প্রবাহিত। সবকিছু ক্ষণে ক্ষণে গতিশীল, পরিবর্তনশীল। এ জগতে এমন কিছু নেই, যা স্থির শাশ্বত। সবাই চলমান জগতে চলমান পথিক, পরিণতি বা মৃত্যুমুখী। সুতরাং মৃত্যুর প্রতি এই ভয় উৎপন্ন করে জন্ম মৃত্যুর বন্ধন হতে জীবনকে মুক্ত করার জন্য পুণ্য সংস্কার ধর্ম-পুণ্য সঞ্চয় করা উচিৎ। যেহেতু কাল জরা-ব্যাধি মৃত্যুর মাধ্যমে সমগ্র জীব জগতকে ও জড় জগতকে গ্রাস করে, ভক্ষণ করে ফেলে। বস্তুত এ কাল কি? কাল বলতে কোন ব্যক্তি-না-কোন শক্তি? এ জিজ্ঞাস্যের জবাবে আসবে-না। কাল বলতে কিছুই নেই। কালের আদিও নেই অন্তও নেই। অথচ বিশ্বব্যাপী কল্পনা-জগত ও জীবন কালাধীন, কাল নিয়ন্ত্রিত, জীবনের সুখ-দুঃখ কালের উপর নির্ভরশীল। উত্থান পতন কালের খতিয়ান সাপেক্ষ। বস্তুত কাল বলতে কোন জড়-চেতনাময় পদার্থ বোঝায় না। কাল মানুষের কল্পনার বস্তু। অথচ এতে সর্বজনবিদিত বিশ্বাস, বিশ্বজনীন স্বীকৃতি ও সম্মতি আছে। এই কাল্পনিক বিষয়কে মানুষ নিজ কাজে ব্যবহার করার জন্য বস্তু-যন্ত্রে ধরে রাখে। কালযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে এ বিশ্ব সর্বক্ষণ নিয়ন্ত্রিত। অথচ শাস্ত্রে আছেঃ

কালো ঘসতি ভূতানি সব্বানের সহত্তনা,

যো সো কালঘসো ভূতো সভূতপচনিং পচি।

কাল সমস্ত প্রাণীকে গ্রাস করে, খেয়ে ফেলে। সাথে সাথে নিজেও অতিক্রান্ত হয়ে যায়। যিনি কালগ্রাসী পুরুষ, তিনি ভূত বা প্রাণী গ্রাসী কালকে বিনাশ সাধন করেন, খেয়ে ফেলেন। সাধারণ ধারনায় কাল যেন দৈব শক্তির ন্যায় এক মহান শক্তি সম্পন্ন পদার্থ। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে কাল সর্বতো শূন্য। কাল-ক্ষিতি, আপ, তেজঃ মরুৎ-এই চতুঃ মহাভূতের অন্তর্গত নয়।

কাল-জ্ঞান আমাদের সকল বস্তুজ্ঞানের মূলে। সকল বস্তুর অস্তিত্ব কালের উপর নির্ভরশীল। কালবোধ না থাকলে বস্তু সম্বন্ধে বোধ সম্ভবপর হবে কিরূপে? সকল প্রকার অস্তিত্ববোধের মূলীভূত কারণ যে কাল, তাতো কোন বহিঃ বস্তু নয়। চিত্ত-চাঞ্চল্যের জন্য চিত্ত বৃত্তির মধ্যে যে সম্মতি-বোধ তা কাল বোধকে সম্ভব করে তোলে। অতঃএব কাল হল সম্পূর্ণ চিত্ত-বৃত্তিক ধারণা। অবিদ্যাজনিত বাসনা বিক্ষোভ নিরুদ্ধ হলে চিত্ত-বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। অতঃপর ধর্ম নৈরাত্ম্য ও ব্যক্তি নৈরাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে অন্তর মহাশূন্যতায় বা অনাদি অনন্ত কালে পর্যবসিত হয়।

কবিগুরু চার বছরের শিশুকন্যাকে বিশ্বের প্রতিনিধি স্বরূপ, স্নেহ-মমত্ব ও আসক্তির প্রতিচ্ছবি রূপে লক্ষ্য করে কবিতা লিখলেন, "যেতে নাহি দেব"। অতি সামান্য ঘটনার ভিতর

থেকে আবিষ্কার করলেন, বিশ্বের শাশ্বত সংবিধানকে। তাতে জগত ও জীবনের এক চিরন্তন বেদনা- বিধুর সত্য উদঘাটিত হয়েছে। এই সত্যের বিধানে জড় ও জীবজগতকে চিরতরে সবকিছু ছেড়ে যেতে বাধ্য করে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও অবিরাম গতিতে চলে যায়, তাতে কারো বাধা বিপত্তি ঘটাবার সাধ্য থাকে না। তথাপি দুর্গত আসক্ত নির্বোধ মনে করে-সে এ জগতে চিরজীবী চিরস্থায়ী। অনাকাঙকানীয় শাশ্বত বিধানের নিকট মন পরাভব মানতে চায় না। সবাইর অন্তররাজ্যে উত্তাল তরংগ 'যেতে নাহি দেব'। আমি নিজেও যাব না, আমার আত্মীয় পরিজন কাউকেও যেতে দেব না'। বিশ্বকবি জগতের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনায় বলেছেনঃ

দিব না দিব না যেতে ডাকিতে ডাকিতে
হু হু করে তীব্র বেগে চলে যায় সবে,
পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্ত কলরবে।
সম্মুখ ঊর্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ
দিব না দিবনা যেতে নাহি শুনে কেউ
নাহি কোন সাড়া।

জগতের সবকিছু চলিষ্ণু, মৃত্যু অভিমুখী। সমস্ত সৌন্দর্য ক্ষনিক, স্নেহ মমত্বের সমস্ত সম্পর্ক অনিত্য রহস্যময়। এ জগতে মৃত্যু সবকিছু হরণ করে। তথাপি চিরজীবী মায়াতৃষ্ণা পরাভব মানতে চাহে না। জগতের সমস্ত মানবীয় সম্পর্ককে মৃত্যু নির্মমভাবে ছিন্ন করে দেয় চোখের সামনে। তথাপি অসীম শক্তিশালী মোহ পরাভব মানতে চাহেনা, স্বীকার করে নেয় না, অস্বীকার করে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সামান্য একটি ফুলকে গভীর ও করুণ চিন্তার কারণ বলে উপলব্ধি করেছিলেন। কবিগুরু তথাগত বুদ্ধ প্রদর্শিত জগতের শাশ্বত সংবিধান-অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মাকে সাধারণ বিদায়ের দৃশ্যের মধ্যে চিরন্তন বেদনার পরিচয়ে উদ্‌ঘাটন করে দেখিয়েছেন। জর্জ এলিয়ট বলেছেন যে- Every departure is element of the death. প্রত্যেক বিদায় দৃশ্যের মধ্যে মৃত্যুর একটি ছায়াপাত থাকে। কবিগুরুও কন্যার নিকট বিদায় চাওয়ার মধ্যে একটা চিরন্তন সত্যের সন্ধান দিয়েছেন। জগত ও জীবনের অনিত্যতা, দুঃখময়তা এবং নিয়তির নিঃসারতা অপেক্ষা প্রকৃত চরিত্রের নিদর্শন আর কি হতে পারে।

বৌদ্ধদর্শনের মূল সুর হলো-অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা। এদের মধ্যে বুদ্ধের সমগ্র দর্শন প্রতিভাত। জগতের সকল পদার্থ-ই অনিত্য, পরিবর্তনশীল। যা অনিত্য তা-ই দুঃখময়, তা-অশাশ্বত নিঃসার। মানুষ ইতর প্রাণী স্থাবর জঙ্গম বলতে আমরা যা কিছু বুঝি, সবই প্রতিক্ষণে অবিরাম পরিবর্তন হচ্ছে। অগ্নি শিখার উর্ধদিকে ক্ষণে ক্ষণে স্ফুলিঙ্গের ক্ষয় এবং সলিতা তৈল হতে ক্ষণে ক্ষনে নতুন উপকরণ গ্রহণ পূর্বক অগ্নিশিখা উৎপন্ন হয়ে পুনঃ পুনঃ পূর্ণ করার ন্যায় উপাদানের উপরই জগৎ ও জীবনের সজীবতা নির্ভরশীল। এজন্য বৌদ্ধদর্শনে মৌলিক নীতি অনিত্য, দুঃখময়, অশাশ্বত ও নিঃসার। পঞ্চ বৎসরের শিশু রাসমোহন আর ৮২ বৎসরের রাসমোহন বাবু আপাতঃদৃষ্টিতে এক ও অভিন্নরূপে প্রতীতি জন্মালেও বস্তুতঃ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল চলিষ্ণু, ক্ষয়িষ্ণু একটা সন্তান সন্ততি বা প্রবাহমাত্র। দৈহিক প্রবাহ অপেক্ষা

মানসিক পরিবর্তন যে কিরূপ ক্ষিপ্রতর তার সংগে উপমান বস্তুতো এ জগতে কিছু বিদ্যমান নেই। এটাই বৌদ্ধদর্শনের পরম রহস্যময় ও আশ্চর্যজনক তাৎপর্য। বৌদ্ধদর্শনের সাথে বিশ্বপ্রকৃতির কি বৈচিত্র্যময় সমন্বয় বিদ্যমান।

অন্তরে আসক্তি তৃষ্ণার দুর্মোচ্য ছায়াপাত স্বাভাবিক নিয়তির বিধান। তথাপি এর প্রতি অস্বীকৃতি তদ্ধেতু কবিগুরু বলেছেন-

চঞ্চল স্রোতের নীরে পড়ে আছে
একখানি অচঞ্চল ছায়া-
অশ্রুবৃষ্টি ভরা কোন্ মেঘের মায়া।

অবিরাম চাঞ্চল্যময় নদীর স্রোত চলছে; তার গতি অব্যাহত, অপ্রতিরোধ্য; কিন্তু এই গতিশীল স্রোতের নীচে একখানি ছায়া অচঞ্চল রূপে পতিত হয়ে পড়ে আছে। এই ছায়ার কিন্তু নড়চড় নেই। এই ছায়া হচ্ছে জগতের মাঝে সুদূর ব্যাপী ক্রন্দনময় বিষাদপূর্ণ মায়ামোহ। এই মায়া মোহই "যেতে নাহি দিব" কাব্যের নায়ক, বক্তা। বস্তুতঃ বৌদ্ধদর্শনে এ ছায়া, কায়া, মায়া-এ তিনে কোন পার্থক্য নেই।

মায়া মোহাচ্ছন্ন লোক ধর্মাধর্ম হিতাহিত, বিচারবুদ্ধি শক্তি-সামর্থ্য হারিয়ে বসে। রাত্রির অন্ধকারের ন্যায় সে জগৎকে একাকার অন্ধকার-ই দেখে। সে আর উদাস করা বিষণ্ন সুরের গান শুনতে রাজী নয়। অথচ এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হয়, চলে যায়। তবু অন্তরের করুণ সুরের মোহে পিছনের দিকে ফিরে ফিরে তাকায়, চোখের জল ফেলে। আর যাওয়াটাই সত্য স্বাভাবিক। মোহের আকর্ষণ মিথ্যে অস্বাভাবিক।

কবিগুরু ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ভৈরবী গান, কবিতা লিখেছেন। এই কবিতার মধ্যেও অনিত্যদুঃখ অনাত্মা নামক বৌদ্ধদর্শনের সমার্থ পরিস্ফুট তাৎপর্য ছায়ার ন্যায় পতিত হয়ে আছে। কবি বলেছেন-

শেষে দেখিব, পড়িল সুখ যৌবন
ফুলের মতন খসিয়া
হায়, বসন্ত বায়ু মিছে চলে গেল শ্বাসিয়া
সেই যেখানে জগৎ ছিল এক কালে
সেখানে আছে বসিয়া।

শৈশবকাল, কিশোর কাল, যৌবনকাল সব হারিয়ে যখন দেখব রাত্রিকালীন সুন্দর বর্ণগন্ধে পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুল রাত্রি অবসানে পচে ঝড়ে গেছে; ফুলের ন্যায় জীবনকাল ফুরিয়ে গেছে। যা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে-লক্ষ-কোটি মুদ্রা মূল্যের বিনিময়ে তা আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। হায়রে! দক্ষিণ দিক থেকে উত্তরদিকে প্রবাহিত বসন্তের বায়ুর ন্যায় সোঁ সোঁ শব্দ করতে করতে এই যে প্রাণবায়ূ চলে গেল তা করুণ সুরের মোহমাত্র। অতএব অনিত্য দুঃখের মাঝে সুখের আশা মিথ্যে। অথচ এ পৃথিবীর ভৌগলিক সংস্থান এককালে যেখানে যেভাবে যা ছিল তা সেখানে সেই নামে ধামে সঠিক ভাবেই বিদ্যমান আছে, থাকবে

পরিবর্তন হবে না। শুধু অহং বিলীন হয়ে যাচ্ছে। জীবের এই জীবন যে সংকটপূর্ণ দুঃখময়। এই দুঃখের উৎপত্তিস্থল কি? কোথায় এই দুঃখের সমাধান হওয়া যে সম্ভব-সব বর্ণনা কবিগুরু কবিতায় করে গিয়েছেন। তিনি পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি আফ্রিকার সাহারা যে অসীম সংকটপূর্ণ তার সাথে মানুষের জীবনের তুলনা করেছেন। মানুষের কর্মময় জীবনও বড় ভীষণ, সুকঠিন, সীমাহীন, অপরিসীম তার ব্যবধান। দূর দূরান্তে মায়ামোহপুরে মায়ামরীচিকারূপ দৈত্য পাহারা দিচ্ছে। সীমার মধ্যে যাকে সাক্ষাৎ পাবে, তার ঘাড় ভেংগে উদরস্থ্ করবে। সাবধান, মায়া মোহপুরের দিকে আর অগ্রসর হয়ো না। যাঁরা চরম সুখ লাভের জন্য নিরাপদ মার্গ রচনা করে মানুষের চিরমুক্তি কামনায় অপেক্ষা করেছেন তাঁদের সেই মার্গ অনুসরণ করে ফিরে যাওয়া ভাল। সেই পথেই জীবনে দুঃখের অবসান ঘটবে। সেখানে চির শান্তির সিংহদ্বার উন্মোচিত হবে। কবিগুরু বলেছেনঃ

এই সংকটময় কর্ম জীবন
মনে হয় মরু সাহারা
দূরে মায়াপুরে দিতেছে দৈত্য পাহারা
তবে ফিরে যাওয়া ভাল তাঁহাদের পাশে
পথ চেয়ে আছে যাহারা।

কবিগুরুর কবিতার এই পংক্তি সুস্পষ্ট ভাবে প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রের আদর্শ নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বৌদ্ধ শাস্ত্র বলেঃ

দুক্‌খং দুক্‌খ সমুপ্পাদং দুক্‌খস্‌স চ অতিক্কমং
অরিযঞ্চট্‌ঠঙ্গিকং মগ্‌গং দুক্‌খুপসম গামিনং

এই জীবন অনিত্য দুঃখময়। জীবন কর্মময়, বড় সংকটাপন্ন। মানুষের জীবনে অশুভ পাপকর্ম হচ্ছে লৌহ শৃংখল আর শুভ পুণ্যময় কর্ম হচ্ছে-হীরক শৃংখল। উভয় কর্মই কিন্তু সংসার কারাগারের সুদৃঢ় বন্ধন। এটার হেতু হচ্ছে-মায়া, মোহ, অবিদ্যা, আসক্তি। আর কর্মের উপশম বা নিরোধ হচ্ছে সাধনা প্রভাবে মায়া মোহপুর বা প্রবৃত্তি রাজ্য থেকে প্রত্যাবর্তন পূর্বক নিবৃত্তি রাজ্যে প্রবেশ করা। উপায় হচ্ছে-মহামানবের আবিষ্কৃত মার্গ বা পথে অপ্রমাদ চিত্তে গমন করা। যাঁরা জীবন দুঃখের অবসান ঘটিয়ে চির শান্তি লাভের উদ্দেশ্যে পথ রচনা করে অপেক্ষমান, তাঁদের সান্নিধ্যে চলে যাওয়া দুঃস্থ মানবের কর্তব্য। কামনা বাসনার তাড়নায় হিংসা ক্রোধের উত্তেজনায় বিষয় বিষের দংশনে, বিকারের জীর্ণতা শীর্ণতায় অতৃপ্ত জ্বলন্ত জীবনে জগৎ করুণ ক্রন্দনে দগ্ধীভুত হওয়া ব্যতীত গত্যন্তরহীন, ভাষাহীন, উদাসীন। কবিগুরু জগতের এই বিরহ রোদনের ব্যর্থ মনোবেদনা উপলব্ধি করে ভৈরবী গান কবিতায় বলেছেন,-

সদা করুণ কণ্ঠ কাঁদিয়া গাহিবে,
হলনা, কিছুই হবে না।
এই মায়াময় ভবে চিরদিন কিছু রবে না।
কেহ জীবনের যত গুরুভার ব্রত
ধূলি হতে তুলি লবে না।

জগতের এই অনিত্যতা, দুঃখময়তা ও নিঃসারতা নামক বৌদ্ধনীতি আদর্শ পরিপূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে। ঐ জগৎ মায়াময়। জরাব্যাধি ও মরণ ধর্মের অধীন। সব কিছু অস্থায়ী। সামাজিক সূত্রে, "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"। বস্তুতঃ জীবনের গহীন মর্মে আধ্যাত্মিক পটভূমিকায় কারো দায়িত্বে কারো করণীয় কিছু নেই। প্রত্যেকেই স্ব স্ব ভাল-মন্দ কর্মাধীন।

ঘরে বাইরে

কবিগুরু উপন্যাস লিখলেন- 'ঘরে বাইরে'।

এই উপন্যাস ত্যাগ, সংযম ও সর্বজীবে মৈত্রী করুণার মাধ্যমে রচিত হয়েছে। এই উপন্যাসের নায়ক ভারতীয় রাষ্ট্র বিপ্লবী নিখিলেশ। তাঁর চরিত্রে আছে একদিকে যেমন বিশ্বপ্রেম জীবে দয়া, তেমনি অন্যদিকে আছে রাজনৈতিক মতাদর্শ বৌদ্ধ জীবন দর্শন ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় জীবনবোধ। নিখিলেশেরই উক্তিঃ"বুদ্ধ পৃথিবী জয় করেছিলেন, আলেকজান্ডার করেননি।" আলেকজান্ডার গায়ের জোরে সৈন্য সামন্তের দাপটে অস্ত্রবলে মেরে-কেটে বিশ্বে অধিকার বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু দু'দিন পরেই সে অধিকার টুটে গেল। বুদ্ধ বিশ্বব্যাপী মানবপ্রাণে যে সংযম, ত্যাগ ও মৈত্রী করুণার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা যুগ-যুগান্তরে, কাল-কালান্তরে উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে রয়েছে, দেশ-দেশান্তরের মানুষ এসে বুদ্ধের সেই জীবনবোধের কাছে মাথা নত করে মানবিক সার্থক পথ খুঁজে পেয়েছে। বুদ্ধের মতাদর্শ আজ বিশ্বব্যাপী। আলেকজান্ডারের লিপিবদ্ধ ইতিহাস ছাড়া অন্য কিছু নেই। তাই আলেকজান্ডার নয়, বুদ্ধকেই যথার্থরূপে বিশ্ববিজয়ী মহামানব আখ্যা দেওয়া যায়। বুদ্ধ ঘরে অর্থাৎ আন্তঃশক্তিতে বিশ্ববিজয় করে চিরস্থায়ী শান্তি সুখের প্রচার প্রতিষ্ঠা করেছেন। আলেকজাণ্ডার বাহ্য শক্তিতেই বিশ্ববিজয় করে স্থায়ী সুখ-শান্তির প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেননি। বাহ্যশক্তি অশাশ্বত, কিন্তু আন্তঃশক্তি মৈত্রী করুণা সংযম সাধনা, সাম্য প্রেম, বিশ্বপ্রেম শাশ্বতকাল অম্লান থাকে।

সংযুক্ত নিকায়ে তথাগত বলেছেনঃ

সমো বিসেসী অথবা নিহীনো।
যো মঞ্‌ঞতি সো বিবদেথ তেন।।
তীসু বিধাসু অবিকম্প-মানো।
সমো বিসেসীতি নতস্‌স হোতি।।

আমিত্ব-বোধ, অভিমান, অহংকার, আস্ফালন, দম্ভ, গর্ব, গোঁড়ামি, আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি অর্থে মান মনোবৃত্তি ব্যবহৃত হয়।

অন্যের সাথে তুলনা করা মানের লক্ষণ। অন্যের সৌন্দর্য, কৌলিণ্য, বুদ্ধিমত্তা, বিদ্যা-বত্তা, শাস্ত্রজ্ঞান, চরিত্র, ধন-দৌলত, জায়গা-জমি ইত্যাদি নানা বিষয়ে নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা করে শ্রেষ্ঠ, সমকক্ষ ও হীন মনে করে বলেই এর নাম মান, অভিমান। শ্রেষ্ঠ মনে করার

মধ্যে যেমন অহং প্রতীতি থাকে, তেমনি থাকে সমকক্ষ ও হীন করার মধ্যে। তৃষ্ণা, দৃষ্টি, মান-এই ত্রিবিধাকারেই মানুষের অহংকার প্রকাশিত হয়। এই ত্রিবিধ মনোবৃত্তি লোভমূলক চিত্তেই উৎপন্ন হয়। তুলনার পদ্ধতি হল এইরূপ-সকলদিকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অপর সকল হীন ব্যক্তির সাথে তুলনা করে অভিমান করে-"আমি কি তাদের মত হীন লোক"? সমকক্ষ ব্যক্তি অপর সমকক্ষ ব্যক্তির সাথে তুলনা করে অভিমান প্রকাশ করে- "আমি তাদের থেকে কোনদিকে কম নাকি"? নীচ হীন ব্যক্তি অপর উন্নত উচ্চতর ব্যক্তির সাথে তুলনা করে অভিমান করে-" আমি কি তাদের মত ধনে জনে মানে এতবড় লোক"? তথাগত আরো বলেছেন,-জগতে যত প্রাণী আছে-সবই নাম-যশের উপর প্রতিষ্ঠিত, নাম-যশেই তাদের তৃপ্তি, তাতেই তাদের রুচি। নাম-যশের আকাঙ্ক্ষায় যথার্থ চরিত্র, প্রকৃতি, স্বরূপ সম্যক উপলব্ধি না থাকাতে সমাজে দেশে পারস্পরিক যত গোলযোগ, যত বিরোধ বিসম্বাদ কলহ বিগ্রহ।

নাম-যশ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে মানুষের জীবনে অধঃপতন, অবক্ষয়, সর্বোন্নতির অন্তরায় নিশ্চিত। অজ্ঞাতে অলক্ষ্যে সর্ব অনর্থের মূল নিদান। জীবনে সর্বাধিক মারাত্মক শত্রু। মান অভিমান মনোবৃত্তিই অন্তরদেশে প্রচ্ছন্ন অপশক্তিরূপে বিরাজ করে জীবনকে পংগু করে রাখে। দাসানুদাস মূর্খ, দীন-হীন, পাগল সর্ব দিকে পরাজিত হয়েও যদি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, এইরূপ হতভাগ্যগণ যদি নিজকে মানী বলে দাবী করে, তবে দীন, হীন নীচ কাকে বলব?

বৌদ্ধ দর্শন আত্মার নিত্যতা, স্থিতিশীলতা বা অস্তিত্ব স্বীকার করে না বটে; কিন্তু সামাজিক জীবনের প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আত্মা ভাবের উপদ্রব, পূর্ণ খেলা যে প্রতিনিয়ত বিদ্যমান, তা আমাদের চোখে পড়ে না। আত্মা মানে না; কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের কর্মকান্ডে প্রতি মুহূর্তে সক্রিয়রূপে মানুষকে যে চিরকাল ভোগের নিমিত্তে প্ররোচণা যোগাচ্ছে। যেহেতু ভোগ বিলাসী ব্যক্তি যে আত্মা বা আমিত্ব কেন্দ্রিক। আত্মাবাদের গভীর তত্ত্বে প্রবেশ না করে আমি যদি সাধারণ অহং প্রতীতির সীমায় আবদ্ধ থাকি, তা হলেও দেখতে পাই-আমিত্ববাদে আমাদের জীবনে কিরূপ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চালাচ্ছে। আমিত্ববাদের একটি প্রধান যুক্তি প্রত্যভিজ্ঞা-আমি, আমার, আমি আছি, সেই আমিই এই, -যে আমি দেখি, সেই আমি শুনি। বস্তুতঃ অতীত, অনাগত, বর্তমান আধ্যাত্মিক, বাহ্যিক, স্থুল, সূক্ষ্ম, হীন, উৎকৃষ্ট ও দূরবর্তী, সন্নিকটস্থ দৈহিক মানসিক যত ভাব-বস্তু আছে, তা আমার নহে, আমি নহি, আমার আত্মা নহে। আত্মা-অনাত্মা সম্পর্কে ভারতীয় সনাতন ধর্মাবলম্বী ও বৌদ্ধপন্থী পণ্ডিতদের মধ্যে শত শতাব্দী কালব্যাপী যে বিবাদ চলে আসছে-আমি সেই সূক্ষ্ম বিতর্ক বিচারে যাবনা। আমি দেখব তার সাহিত্যিক দিকটা সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা কিরূপ। অধিকন্তু তাঁর ভূমিকার সাথে বৌদ্ধধর্মের নীতি আদর্শের সামঞ্জস্য কতুটুকু ? কবিগুরুর সাহিত্যে বৌদ্ধদর্শন ও বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রভাব বা কিরূপ?

সূত্র নিপাত গ্রন্থে উদ্ধৃত আছেঃ

অস্মিমানো যো বিনয়ো এতং বে পরমং সুখং।

অভিমান বা অহংকার পরিত্যাগই পরমা শান্তি নির্বাণ।

অনাত্মাবাদী আচার্য নাগর্জুন বলেনঃ

আত্মন্যমতি চাত্মীয়ং কুত এব ভবিষ্যতি।
নির্মমো নিরহংকারো সমাদাত্মীয় ত্বযো।।
মমেতি অহং ইতি ক্ষীণে বহিরধ্যাত্মস্ এব চ।
নিরুধ্যেতে উপাদানং তৎক্ষণাৎ জন্মনঃ ক্ষয়ঃ।।
কর্মক্লেশ ক্ষয়াৎ মোক্ষঃ।

আত্মা না থাকলে আত্মীয় কোথা হতে আসবে? আত্মা ও আত্মীয় ভাব শান্ত হলে অহংকার ও মমকার দূরীভূত হয়। অন্তরে বাহিরে আমি ও আমার ভাব অন্তর্হিত হলে কামনা, ভ্রান্তদৃষ্টি, শীলব্রত পরামর্শ ও আত্মবাদ এই চতুর্বিধ উপাদান নিরুদ্ধ হয়। উপাদান ক্ষয় হলে জন্মের ক্ষয় এবং কর্মক্লেশ ক্ষয়হেতু মুক্তি সুনিশ্চিত। অহংকার মমকার বা আমিত্ব নিরুদ্ধ হলেই নির্বাণ বা পরম সুখ সিদ্ধ হয়। অহংপ্রতীতি শূন্যতাই বোধিলাভের নিশ্চিত উপায়। তৃষ্ণা দৃষ্টি মানের চরিতার্থতার অভাবে কিংবা সত্যের অনুপলব্ধিতেই হিংসা ক্রোধের উৎপত্তি। ক্রোধ ত্রিবিধাকারে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। নিশ্চিত বিষয়ের অলাভে কিংবা অনিশ্চিত বিষয়ের প্রাপ্তিতে উত্তেজনা বা ক্রোধের সঞ্চার হয়। এটা সাধারণ। যখন কাকেও বধপ্রবৃত্তি নিয়ে প্রচণ্ড ক্রোধের সঞ্চার হয়, তখন ক্রোধ 'প্রতিঘ' নামে কথিত হয়। এটা মারাত্মক। আর যখন ক্রোধ বিষয়ক কোন ঘটনার স্মৃতি অন্তরে গেঁথে রাখে, এর বহিঃপ্রকাশ নেই, প্রতিশোধের সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত দীর্ঘকাল যাবৎ অন্তরে তুষের অগ্নিতুল্য ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে, এই জাতীয় ক্রোধকে বলে 'উপনাহ'। এটা সর্বাধিক ভীষণ ক্রোধ বা আত্ম-শ্লাঘা আত্মাভিমান মানুষের জীবনে আপন মুন্ডে কুঠারাঘাত বা আত্ম-হত্যা তুল্য। তথাগত বুদ্ধ ধর্মপদ গ্রন্থে বলেছেনঃ

ক্রোধং জহে বিপ্পজহেয্য মানং,
সঞ্ঞোজনং সব্ব মতিক্কমেয্য,
তং নামরূপস্মিং অসজ্জমানং,
অকিঞ্চনং নানুপতন্তি দুক্খা।

ক্রোধ সংবরণ কর, অভিমান পরিত্যাগ কর। সর্ববিধ সংযোজন অতিক্রম কর। যিনি নামরূপের প্রতি নির্লিপ্ত ও অকিঞ্চন দুঃখরাশি তার অনুসরণ করতে পারে না। ক্রোধ, প্রতিঘ ও উপনাহ-এই ত্রিবিধ ক্রোধ আর অহংকার, মান, অভিমান ইত্যাদি অশুভ মনোবৃত্তিগুলো সংক্ষেপে ক্রোধ ও মান জমজ ভাই, এক জাতি, এক গোত্র। পরস্পর অবিচ্ছেদ্য মনোবৃত্তি। যখন মানুষের অন্তরে দৌর্মনস্য সহগত মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন অকুশল মনোভাব জাগে বা চিত্ত প্রবাহে উৎপন্ন হয়, সাথে তার সহজাত সহযোগী রূপে উৎপন্ন হয়। অভিধর্মের বিচারে একটি অকুশল চিত্তের সাথে আটাশ, পক্ষান্তরে একটি কুশল চৈতসিকের সাথে যুক্ত হয় ছয়ত্রিশ প্রকার কুশল মনোবৃত্তি।

যার অন্তরে ক্রোধ ও মান-অশুভ মনোবৃত্তি যখন জাগে তখন অতিশয় লাবণ্যময়

অনিন্দ্যসুন্দর আকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিও ভীষণ ভয়ংকর কদাকার দৃশ্য ধারণ করে। তখন তার হিতাহিত বিবেচনা থাকে না। বিচারবুদ্ধি লোপ পায়। তদ্দর্শনে মানুষের চক্ষু স্থির ও নাসিকা কুঞ্চিত হয়। পদ্মপত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ন্যায় লাল রঙের হৃদপিণ্ড কৃষ্ণবর্ণ আকার ধারণ করে। শ্বাস-প্রশ্বাস অস্বাভাবিক বড় হয়ে যায়। ফলে আয়ুষ্কাল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতিক্রোধে মানুষের রক্তবমি হওয়ার কথা শাস্ত্রে বর্ণনা আছে। এ জগতে মানবতার পরিপন্থী যত প্রকার অশুভ শক্তি আছে-ক্রোধ ও মান তাদের মধ্যে সর্বাধিক মারাত্মক। যেখানে ক্রোধ সেখানে মান, যেখানে মান সেখানে ক্রোধ, আত্মম্ভরিতা বা আত্মা এর দ্যোতক। অনাত্মা এর বিপরীত। নিরহংকার নির্মমকারই অনাত্মা। এই আত্মা ও অনাত্মাবাদ নিয়ে ভারতীয় দার্শনিক পণ্ডিতদের মধ্যে যত খণ্ডন-মণ্ডন বাক-বিতণ্ডা বিবাদ বিসম্বাদ শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরে চলে আসছে, কবিগুরু সে সব বিতর্কে না গিয়ে সহজবোধ্য অতি ক্ষুদ্র বাংলা শব্দে সমাধানের পথ খুঁজে বের করেছেন অতিশয় প্রচ্ছন্নাকারে। সেই শব্দটি হচ্ছে মান যা মনুষ্য জীবনে সর্বাধিক মারাত্মক শত্রু, যাকে জড়-চেতনের সমষ্টির প্রতি মানুষ আরোপ করে অহং বা আমি। লোভ, দ্বেষ, মোহাদি সকল প্রকার মনোবিকার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে চিত্ত যখন সর্বশূন্যতা প্রাপ্ত হয় এবং প্রজ্ঞা, মৈত্রী করুণায় পরিপূর্ণতা লাভ করে-সেই অবস্থাকে বৌদ্ধশাস্ত্রে পরম বিশুদ্ধি, চরম সত্য বা তথতা বলা হয়। এই তথতা বৌদ্ধধর্মে নির্বাণ মুক্তির নামান্তর। তথতায় উপগত হয়েছেন বলে বুদ্ধের অপর এক গুণাত্মক বিশেষণ হল-তথাগত। তথতা বা নির্বাণ মুক্তির চারটি স্তর মৌলিক থেরবাদ বৌদ্ধধর্মে বর্ণিত আছে।

১। প্রথম স্তর স্রোতাপত্তি। সাধনার ঊর্ধ্বস্তরে উপনীত হলে চিত্ত কতক ক্লেশশূন্যতা প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞার আলোকে উদ্ভাসিত হয়। এই স্তরে দশ প্রকার সংযোজনার মধ্যে ত্রিবিধ সংযোজন বা চিত্তক্লেশ ধ্বংসীভূত হয়। (ক) সৎকায় দৃষ্টি (দৈহিক শোভা সৌন্দর্যময় আসক্তিজনিত মিথ্যা দৃষ্টি) (খ) বিচিকিৎসা (অশ্রদ্ধাজনিত সন্দেহ, অবিশ্বাস)। (গ) শীলব্রত পরামর্শ (ব্রতশুদ্ধিবাদ, ব্রতাদি পালন দ্বারা জীবন বিশুদ্ধ হয় বলে মিথ্যা ধারণা)। সাধনালব্ধ প্রজ্ঞার প্রভাবে এই সকল ক্লেশ নিরসনপূর্বক নির্বাণস্রোত প্রাপ্ত হওয়ার নাম স্রোতাপত্তি। এটা মহাযান নীতি অনুসারে প্রথম স্তর 'শূন্যতার' সাথে তুলনীয়।

২। দ্বিতীয় স্তর হল-সকৃদাগমন। এই স্তরে সাধনালব্ধ তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা প্রভাবে দ্বিবিধ সংযোজন-কামরাগ (আসংগলিপ্সা) ও ব্যাপাদ (পরের ক্ষয় ক্ষতি বা বিপদাকাঙ্ক্ষা) একেবারে ক্ষীণতা বা খর্বতাপ্রাপ্ত হওয়ায় জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে একবারমাত্র আগমন হয়। একাধিকবার আগমন করতে হয় না। এজন্য তিনি সকৃদাগামী নামে অভিহিত। ইহা মহাযান 'অতিশূন্যতার' সাথে তুলনীয়।

৩। তৃতীয় স্তর হল-অনাগমন। এই স্তরে সাধনালব্ধ প্রজ্ঞার প্রভাবে কাম-রাগ ও ব্যাপাদ অনবশেষ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইহ জন্মে চতুর্থ স্তর অর্হত্বে উন্নীত না হলে ব্রহ্মলোকে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তথা হতে চ্যুত হয়ে মর্তে পুনরাগমন করেন না। ব্রহ্মলোকেই অবশিষ্ট সংযোজন ক্ষয় সাধন করেন বলে অনাগামী নামে অভিহিত। এটা মহাযান 'মহাশূন্যতার'

সাথে তুলনীয়। এবং পূর্বোক্ত স্তরদ্বয় হতে বিশুদ্ধতর ও উর্ধগামী। তথাপি কতগুলো ক্লেশ নিত্য চিত্তপ্রবাহে অতি ক্ষীণভাবে প্রবাহিত হতে থাকে।

৪। নির্বাণ মুক্তির চতুর্থস্তর-অর্হত্ব। এতে পাঁচ প্রকার সংযোজনঃ রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যা নিরবশেষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞার পরিপূর্ণ আলোকে মোহান্ধকার দূরীভুত হওয়ায় সর্ব সংযোজন বা সর্বক্লেশ শূন্যতা প্রাপ্ত হয়। এতে লেশমাত্র ক্লেশ অবশিষ্ট থাকে না। এটা মহাযানপন্থী বৌদ্ধমত-'সর্বশূন্যতার' সাথে তুলনীয়। অবিদ্যা মোহজনিত যত প্রকার ক্লেশ আছে-সাধনা প্রভাবে উদ্ভুত প্রজ্ঞা সমাবেশে বিধ্বংসিত সর্বক্লেশশূন্যতা অবস্থাকে চর্যাপদে বলা হয়েছে সোনা। সোনা বা সর্বশূন্যতা মহাকরুণার তরীতে অসংখ্য কোটি মণ পরিমিত সোনার ধান ধরবার অনন্ত অফুরন্ত অবকাশ আছে, বহন করে সব নিয়ে যাবে। এক কণাও রেখে যাবে না; কিন্ত এক বিন্দু রূপা ধরবার স্থান সেখানে নেই। এটা ধাতব পদার্থের স্থান নহে। যেহেতু সর্বশূন্যতা বা নির্বাণ ধাতুর ঊনত্বও নেই, পূর্ণত্বও নেই।কেবল সেখানে মনোময় অনুভূতিপ্রধান একটা মহান উপলব্ধি আছে। সশরীরে নিরুপাদিশেষ নির্বাণ গমনের অবকাশ বা অধিকার নেই।

সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যে বিদ্যাসাগরীয় শব্দের ব্যবহার নেই। সব সর্বসাধারণের সহজবোধ্য অথচ ভাবগম্ভীর, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দে সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্য ভরপুর। বৌদ্ধশাস্ত্রে পারিভাষিক দুর্বোধ্য বহু শব্দের সংযোজনা আছে। যে সব শব্দ দুর্বোধ্য কঠিন, সাধারণের অব্যবহার্য্য অনধিগম্য কবিগুরু সে সব শব্দ ব্যবহার করেননি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যে শব্দটি মানুষের জীবনে সর্বাধিক মারাত্মক শত্রু এবং যে শব্দটি নিয়ে ভারত বাংলা উপ-মহাদেশে শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে যুগ-যুগান্তর হাজার হাজার বছর ব্যাপী পন্ডিতগণের মধ্যে পরস্পর বাক-বিতন্ডা, বাদ-বিবাদ, যা কোন কালে কোন যুগে সমন্বয়, মীমাংসার সম্ভাবনা নেই; যে শব্দটি বৌদ্ধসাধনার চরম অর্হত্বে উপনীত না হলে ইহার সার্থক তাৎপর্য জীবনে কখনো প্রতিফলন সম্ভবপর নয়, সে শব্দটি হচ্ছে বৌদ্ধশাস্ত্রীয় পরিভাষা-অনাত্মা। অনাত্মার বাংলা ভাষায় সহজবোধ্য শব্দ হচ্ছে- মান, অভিমান, অহংকারের নামান্তর। মানুষের জীবনে দোষপ্রবণ বিকার অনেক কিছু থাকে। কবিগুরুর সুবিশাল নেত্রের নজর অন্য কোন ক্লেশ বা বিকারে পড়ল না। তিনি অহংকারকে গুরুত্ব দিয়ে সর্বপ্রথম গান রচনা করেছেন। যেমন পুরাকালে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ মনোবিকার ধ্বংসের সন্ধান দিয়ে চর্যাগীতিকা রচনা করে গিয়েছেন।

মৌলিক বৌদ্ধশাস্ত্রে উদ্ধৃত আছে ঃ

অস্মিনাস্স যো বিনযো তং বে পরমং সুখং
অহংকার নিরোধ করাই পরম সুখ নির্বাণ।

কবিগুরুর গান রচনার উপলক্ষ্য সর্বাধিক মনোপ্রদুষ্ট বিকার অহংকার। তা নিম্নরূপঃ
ব্রহ্ম সংগীতঃ-

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলির তলে
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।

নিজেরে করিতে গৌরব দান
নিজেরে কেবলই করি অপমান
আপনাকে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরি মরি পলে পলে
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।
আপনারে যেন না করি প্রচার
আমার আপন কাজে,
তোমার ইচ্ছা করো হে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে
যাচি হে তোমার পরম শান্তি
পরাণে তোমার পরম কান্তি
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয় পদ্ম দলে
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।

বুদ্ধপ্রশস্তি গীতিকায় তথাগত বুদ্ধকে লক্ষ্য করে প্রাণের আকুতি প্রকাশে কবিগুরু বলেছেনঃ

এস দানবীর,
দাও ত্যাগ কঠিন দীক্ষা।
মহা ভিক্ষু, লও সবার অহংকার ভিক্ষা।।

একদিন কবিগুরুর চোখ পড়ল এক গৃহস্থের কুমড়া মাচার উপর। তিনি দেখলেন একটি খুব বড় কুমড়া মাচার নীচে ঝুলে পড়েছে, আর সারা কুমড়া লতিকায় অফুরন্ত ফুল ফুটে আছে। তিনি সেইদিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, অন্তরে এলো গভীর ভাব। অতঃপর স্বভাবসিদ্ধ কবির মুখে ভাষা নির্গত হতে লাগলঃ

কুষ্মাণ্ডের মনে মনে বড় অভিমান,
বাঁশের মাচাটি তার পুষ্পক বিমান।
কভুও মাটির পানে তাকায় না তাই,
আকাশের চন্দ্র সূর্য করে ভাই ভাই।
নভশ্চর বলে তার মনের বিশ্বাস,
শূন্য পানে চেয়ে তাই ছাড়িছে নিঃশ্বাস।
ভাবে মনে শুধু একটি মোটা বোঁটা মোরে,
বেঁধেছে ধরার সাথে কুটুম্বিতা ডোরে।
বোঁটা যদি কাটা যেত অমনি পলকে,
উড়ে যেতাম অনায়াসে জ্যোতির্ময় লোকে।
বোঁটা যবে কাটা গেল বুঝিল সে খাঁটি,
চন্দ্র সূর্য্য কেউ নাই সব তার মাটি।

তথাগত বুদ্ধের এই নীতি নির্দেশ জীবনের মধ্যে প্রতিফলন ছাড়া দ্বিতীয় উপায় নেই। কায়-

মনে বাক্যে সংযমিত হলেই সর্বত্র সংযমিত হয় এবং এই সংযম শক্তিতে জীবনে দুঃখের অবসান ঘটে। এ জগতে মানবতার পরিপন্থী যত শক্তি আছে-মান ও ক্রোধ তাদের মধ্যে প্রধান প্রত্যয়। মান ও ক্রোধের আগুনে আপন জীবনে, সমাজে, তথা জগতে যাতে দাবানলের সৃষ্টি হতে না পারে, সেজন্য মানবতার সাধককে সর্বপ্রযত্নে ক্ষমাশীলতা, সাম্য, মৈত্রী-করুণার অনুশীলন করতে হবে। জীবনে যত অত্যাচার অবিচার, অন্যায় আসুক না কেন সর্বক্ষেত্রে অহিংস প্রতিরোধ করতে হবে, অসীম ধৈর্য ধারণ করতে হবে। প্রতিহিংসা গ্রহণে বিরত থাকতে হবে। জীবনে, পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে যত বিরোধ বিসম্বাদ সৃষ্ট হয়, সবই এই দুই প্রকার কালসর্পের বিষাক্ত ছোবলের পরিণামেই হয়ে থাকে। সপ্তম শতকে আচার্য শান্তিদেব তাঁর বোধিচর্যাবতারে বলেছেনঃ

সর্ব মেতত্ সুচরিতং দানং সুগত পূজনং
কৃতং কল্পং সহস্রৈর্যত্ প্রতিঘঃ হন্তি তত্।।

এখন শুধু ক্রোধ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলবার বাসনা। পূর্বোক্ত শ্লোকে বলা হয়েছে,-সহস্র কল্পব্যাপী চরিত্রের শুভ সাধনাকে, দানাদি কুশল কর্ম সম্পাদনকে এবং বুদ্ধ পূজাদি সমস্ত মহান কর্মকে জীবনের প্রতি একমাত্র প্রচণ্ড বিদ্বেষ এক মুহূর্তে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। যেহেতু দ্বেষের সমান পাপ নেই, ধৈর্যের সমান তপ বা পুণ্য নেই। অতএব, বিবিধ উপায়ে এবং পরম যত্নে ক্ষমাধর্মের সাধন করবে। যেহেতু দ্বেষ-শল্য হৃদয়ে বিদ্ধ হলে মনে শান্তি থাকে না, প্রীতি সুখ অনুভব হয় না, সুনিদ্রা হয় না, ধৈর্যহারা হয়ে যায়।

এক্ষেত্রে একটি বিষয় অবতারণা করা অপ্রাসংগিক হবে না। বিবেচনা করে বলছি,- জ্যোতিষ শাস্ত্রে দশা, গ্রহ, ফাঁড়া, মহা বিঘ্ন-জনক গ্রহ নক্ষত্র যোগরূপে বর্ণনা আছে, তাতে মনুষ্য জীবনে নানা প্রকার বিহিত হয়। এই অন্তরায়গুলো কি কারণে, কিরূপে বিহিত হয়, কোথায় অবস্থিত বা সঞ্চিত থাকে ? কিসের প্রভাবে বা মানুষ এসব অন্তরায় থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে, তার সামগ্রিক বর্ণনাও জ্যোতিষ শাস্ত্রে রয়েছে।

পূর্ব জন্ম কৃতং কর্মং গ্রহরূপেন সংস্থিতম্।
তেনায়ু লভতে জন্তু সুখং দুঃখঞ্চ জন্মনী।

পূর্ব জন্মার্জিত দুষ্কর্ম প্রভাবে মানুষের জীবনে দশা, দুর্নিমিত্ত, পাপ গ্রহ, অশুভ গ্রহ বা ফাঁড়ারূপে দুর্বিপাক প্রচ্ছন্ন শক্তি সঞ্চিত হয়, তাই দুঃখ অশান্তি, অল্পায়ু, দুর্ভোগরূপে যথাকালে প্রতিফলিত হয়। আবার যে জাতীয় পূর্ব দুষ্কর্মের প্রভাবে গ্রহ ফাঁড়া উপচিত হয়- সেই জাতীয় দুষ্কর্মের যদি ইহজন্মে ও পুনরাবৃত্তি ঘটে, তবে গ্রহ পাপ গ্রহ ফাঁড়াগুলো আরো জোরদার হয়। এজন্য মানুষ অশুভ দশা, গ্রহ, পাপগ্রহ, ফাঁড়া কাটাবার নিমিত্ত নানা চেষ্টা ও তান্ত্রিক উপায় অবলম্বন করে। কেউ কেউ শান্তি যজ্ঞ, গ্রহ-পূজা, পাথর ধারণ, কবচ ধারণ ইত্যাদি কর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। এসব উপায় অবলম্বনে কোন কোন ক্ষেত্রে সফল হয়, কোন ক্ষেত্রে আংশিক সফল হয়, কোন ক্ষেত্রে আদৌ হয় না। যেহেতু দশায় দশায় রাশিতে রাশিতে কাটাকাটি, যোগ-বিয়োগ, ক্ষয় পূরণ আছে। ভেড়ার যুদ্ধের মত। দুই

ভেড়ার মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হলে কখন একের জয় হয় কখন অন্যের জয় হয়। সর্বশেষে অধিকতর শক্তিশালী ভেড়াটি জয় লাভ করে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ভেড়াটি পরাজিত হয়। সেরূপ গ্রহ ফাঁড়া দুর্বল হলে অধিকতর শক্তিশালী শান্তি প্রচেষ্টা কার্যকরী হয়, গ্রহ ফাঁড়া কাটাতে সক্ষম হওয়া যায়। অন্যথা শক্তিশালী গ্রহ ফাঁড়ার তাৎপর্য বলবৎ থাকে। এদের প্রতিফলনই অকাট্য থাকে।

বৌদ্ধদর্শনে এর অনুরূপ যুক্তি এবং দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণ কর্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। জ্যোতিষ দর্শনে ও বৌদ্ধ দর্শনে সামঞ্জস্য রয়েছে হুবহু। যেমন-কর্মতত্ত্বের বিশেষ বিশ্লেষণে দেখা যায়- পূর্ব জন্মের দুষ্কর্মজনিত দুর্বিপাক কিংবা ইহ জীবনের দুষ্কর্মজনিত দুর্বিপাক সঞ্চিত হয়, তা স্বর্গ মোক্ষের বিপত্তি ঘটায় বা বর্তমান জন্মের উন্নতি পথের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নানা দুঃখ অশান্তি সৃষ্টি করে, কিছুতেই উন্নতি পথে অগ্রসর হতে দেয় না। শান্তি, সুখ, আয়ু ভোগাদি বিঘ্নতা সৃষ্টি করে, সকল দিকে চরম অবনতি ঘটায়, এমনকি মৃত্যুতুল্য দুঃখ কিংবা রক্তক্ষয়ের মাধ্যমে অল্প বয়সে আকস্মিক মৃত্যু ঘটানো অসম্ভব নহে। বৌদ্ধশাস্ত্রে এগুলোকে বলে বিপত্তি, বাধা, অন্তরায়, মার। কুশল কর্মের শুভ বিপাকের বিচারে দুস্কর্মজনিত দুর্বিপাকের বিপরীত তাৎপর্য রয়েছে। আবার সুকর্মে দুষ্কর্মে পাপে-পুণ্যে কুশল অকুশলে যোগ-বিয়োগ আছে কাটাকাটি ও জয়-পরাজয় আছে। অন্তরায়, বিপত্তি ও মারের প্রাদুর্ভাব জীবনে যাতে না ঘটে তজ্জন্য মানুষ কত কত মাংগলিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সুস্থ সবল দেহে বেঁচে থাকলে মানুষ মনে করে মাংগলিক অনুষ্ঠান সফল হয়েছে। বস্তুতঃ অন্তরায় বাধা বিপত্তি, মারের জন্মান্তরের উৎপাত পুরাপুরি বিনাশপ্রাপ্ত হয় কিনা তা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, অনিশ্চিত, অপ্রত্যক্ষ। পূর্বজন্ম হোক বা বর্তমান জন্মের হোক-যত অন্তরায় বিপত্তি মার, পাপ, গ্রহ, ফাঁড়া, জীবন সন্ততির মধ্যে লুকায়িত থাকুক না কেন এদের সম্পূর্ণ ধ্বংসের ব্রহ্মাস্ত্র বা এটমবোম হচ্ছে ভাবনাময় কুশল কর্ম, ইহা সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ। বৌদ্ধধর্মের মৌলিক ও প্রকৃত দার্শনিক তত্ত্ব হল-প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি। কবিগুরু কোনরূপ জটিল দুর্বোধ্য তত্ত্বে উপনীত না হয়ে সর্বসাধারণের সহজবোধ্য রূপে চতুরার্য সত্য ব্যাখ্যা করেছেন। দুঃখ কি? দুঃখের উৎপত্তি কি প্রকারে হয়, দুঃখের নিরোধ কি এবং কিভাবে দুঃখের নিরোধ হয়, অর্থাৎ দুঃখ নিরোধের উপায় কি ? এই চতুর্বিধ জ্ঞানের মাধ্যমে যে সম্যক দৃষ্টি লাভ ঘটে তাই চতুরার্য সত্য জ্ঞান। জীবনের অসংখ্য দুঃখের মধ্যে শাস্ত্রে আট প্রকার দুঃখের কথা উল্লেখ আছে-জন্ম,জরা -ব্যাধি, মরণ, প্রিয়-বিয়োগ, অপ্রিয় সংযোগ, ইপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি, সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান। এই আট প্রকার দুঃখের কারণ বা উৎপত্তি নির্দেশ করতে গিয়ে তথাগত বুদ্ধ বলেছেনঃ

যে ধম্মা হেতুপ্পভবা তেসং হেতুং তথাগতো আহ,
তেসং যো নিরোধো এবং বাদী মহাসমণো।

এই বিশ্ব জগৎ হেতু পরম্পরা বা কার্য-কারণ সম্পর্কে গাঁথা। একের অবলম্বনে অন্যের উৎপত্তি, একের নিরোধে অন্যের নিরোধ। একেই বলা হয়-কার্যকারণ পরম্পরা বা হেতু ফল

পরম্পরা। প্রতীত্য ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ

ইমস্মিং সতি, ইদং হোতি, ইমস্‌সুপ্পদা ইদং উপ্পজ্জতি।

এবং

ইমস্মিং অসতি, ইদং নহোতি, ইমস্‌স
নিরোধা, ইদং নিরুজ্ঝতি।

এটা হলে ওটা হয়, এটার উৎপত্তিতে ওটার উৎপত্তি, এটা না হলে ওটা হয় না। এটার নিরোধে ওটা নিরুদ্ধ হয়। অর্থাৎ হেতুর উৎপত্তিতে ফলের উৎপত্তি, হেতুর নিরোধে ফলের নিরোধ। এই হল প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতির মূল সূত্র। জড়জগৎ ও মনোজগৎ এই নীতি দ্বারা পরিচালিত। ক্ষণে ক্ষণে হেতু ফলের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার স্রোতে জীব-জগত ও বস্তু-জগৎ ক্ষণিকের জন্যও স্থিতি লাভ করতে পারে না। উৎপত্তি স্থিতি বিলয় ক্ষণে ক্ষণে সাধিত হচ্ছে। জীব ও বস্তু প্রতিক্ষণ গতিশীল। এই ক্ষণভঙ্গুর জীব ও জগৎ সম্বন্ধে এক কথায় ব্যক্ত করলে বলতে হবে-বুদ্ধ বচনের নীতি অনিত্যতা ও অনাত্মা। এ ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় ডঃ নলিনাক্ষ দত্তের একটা উক্তি অতিশয় প্রণিধানযোগ্যঃ

The subtlety of the Buddhist interpretation of Kshanik is unique and may be regarded as a contribution to Indian thought. In short, it explains fully the dynamism of worldly objects or ceaseless change that takes place in worldly objects in nature.

বিশ্বে জীবনস্রোত অনন্ত বহমান। বৌদ্ধদর্শনের সকল ক্ষেত্রেই জনম-জীবন-মরণের মাধ্যমে এই অন্তহীন চলার ছন্দকে বিচিত্রভাবে-রূপে ব্যক্ত করা হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেও বৌদ্ধদর্শনের ছায়া পতিত হয়ে আছে।

জগতে অনন্ত বহমান স্রোতের মধ্যে মনুষ্যাদি জীবের অন্তরে প্রবাহিত হচ্ছে চিত্তপ্রবাহ। এই প্রবাহের কাল নিরূপণ এক অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। ইহা কাল্পনিক কালের ন্যায় অনাদি অনন্ত। নীরবে নিঃশব্দে অবিরাম অব্যাহত তার গতি। ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল। এখন দেখা যাক-এই প্রবাহটি বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোন্ থেকে কিভাবে কোথায় প্রবাহিত হয়?

জীবগণের জীবনের দু'টি দিক। একটি আধ্যাত্মিক, অপরটি বাহ্যিক। আধ্যাত্মিক দিক হল-চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা, কায় ও মন। বাহ্যিক দিক হল- রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ভাব। এদের পরস্পর সম্পর্ক অতীব ঘনিষ্ট, অহরহঃ, প্রতিক্ষণিক। বৌদ্ধশাস্ত্রে রয়েছেঃ

চক্খুং পটিচ্চ রূপে চ উপ্‌পজ্জতি চক্খু বিঞ্ঞানং, তিন্নং সংগতি ফস্‌সো, ফস্‌সো পচ্চযা বেদনা, বেদনা পচ্চযা তন্‌হা। চক্ষেন্দ্রিয় রূপাবলম্বনে সংঘর্ষিত হলে চক্ষুবিজ্ঞান বা চিত্ত উৎপন্ন হয়। চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি, দৃশ্যমান রূপ এবং চক্ষুবিজ্ঞান বা দর্শনকারী চিত্ত-এই তিনের যখন সংস্পর্শ ঘটে, সমন্বয় হয়, তখন সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা বা উপেক্ষা বেদনার অন্যতম বেদনা বা অনুভূতির উদ্রেক হয়। বিজ্ঞান বা চিত্ত যদি রূপাবলম্বনকে সুন্দর, শুভ,

নিত্য, সত্য রূপে দর্শন করে, তাহলে সুখ বেদনা, যদি রূপাবলম্বন কুৎসিৎ, কদাকার ও অমনোজ্ঞরূপে অনুভূত হয়, তাহলে দুঃখ বেদনা। আর চিত্ত বিষয়বস্তুকে সুন্দর-অসুন্দর, শুভাশুভ, মনোজ্ঞ অমনোজ্ঞ কোন নির্দিষ্ট আকারে গ্রহণ না করে, রূপ বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবচেতন থাকে, তখন উপেক্ষা বেদনা উৎপন্ন হয়। এই ত্রিবিধ বেদনার মধ্যে সুখ বেদনা থেকে লোভ, দুঃখ-বেদনা থেকে দ্বেষ এবং উপেক্ষা বেদনা থেকে মোহ উৎপন্ন হয়। এরূপে দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রান, আস্বাদন, স্পর্শন ও চিন্তন কর্মে এক সমতুল্য। এই ষড়বিধ ইন্দ্রিয় ও ষড়বিধ বিষয়বস্তুর সম্পর্কে অবিরাম অবিশ্রাম নীতিতে লোভ, দ্বেষ, মোহ অহরহঃ গতিতে উৎপন্ন হয়ে চল্‌ছে। চক্ষ্বাদি ইন্দ্রিয় সমূহ ও বাহ্য রূপাদি বিষয়বস্তুর সংযোগ ঘটলে মনের উপর রেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে। ইহাতে মন স্পন্দিত ও আলোড়িত হয়। তৎ প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে এতে চিত্ত প্রবাহের মধ্যে ছাপ পড়ে যায়। সেই ছাপে যেই কর্মশক্তি সঞ্চিত হয়, তা দম্ প্রদত্ত ঘড়ির স্প্রিং এর ন্যায় সেই সঞ্চিত শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত থাকে। সেই কর্মশক্তিই উপযুক্ত, অনুকূল ও সহযোগী সুযোগ সুবিধা লাভ করে জন্ম, জরা, আয়ু এবং ভোগাগারে ক্রমাগত প্রকাশিত হয়ে ফল প্রদান করতে থাকে। ফনোগ্রাফ যন্ত্রের সামনে যেরূপ গান গীত হয়, সেই সংগীত শব্দ সংস্কাররূপে ঐ যন্ত্রে প্রচ্ছন্ন শক্তির আকারে আবদ্ধ হয়। পরে কৌশলে যদি এর উদ্বোধন করতে পারা যায়, তাহলে সেইরূপ সংগীতই শ্রুতি গোচরে আসে। সেরূপ জীবের চক্ষ্বাদি ইন্দ্রিয় রূপাদি অবলম্বনে সংঘর্ষিত হয়ে কর্ম গঠিত হয় এবং কর্ম সংস্কার চিত্তপ্রবাহরূপ যন্ত্রে সঞ্চিত ও রক্ষিত হয়। এই প্রবাহের আদি উৎস কোথায়-তা অজ্ঞাত অপরিজ্ঞাত ব্যাপার। এই প্রবাহের আদি নির্ধারণ অতি দুঃরূহ হলেও অন্ত সাধন অসম্ভব নহে। সাধনার প্রভাবে অন্ত সাধন সম্ভবপর। নচেৎ, এই প্রবাহ যেমনি অনাদি, তেমনি অনন্ত যদি হয়, তবে জীবের মুক্তির উপায় থাকত না। ক্ষণে ক্ষণে প্রবাহিত নদীর স্রোতের ন্যায় ইহা জন্ম হতে জন্মান্তরে প্রবহমান। ইহা সর্বক্ষণ চলমান। জীবগণ চলমান জগতে চলমান পথিক। যেমন জীব-জগৎ, তেমন বস্তু-জগৎ। ক্ষণিক পরিবর্তনশীল। অনিত্য অস্থির। এটাই মৌলিক বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি। কার্য-কারণরূপে এই প্রবাহ সুনির্দিষ্ট নীতি শৃঙ্খলাবদ্ধ হলেও তার গতি নির্ধারিত করা সুকঠিন। এই প্রবাহকে এক বলাও ভ্রান্তদৃষ্টি, ভিন্ন বলাও মিথ্যাদৃষ্টি। এক নদীতে মানুষের দু'বার অবগাহন হয় না, সন্ধ্যায় দীপশিখা ও ভোর রাত্রের দীপশিখাটি একও নয়, ভিন্নও নয়। এটা প্রবাহ, সন্ততি, অবিরত গতিশীল। এই গতির গন্তব্য কোথায়, কোথায় তার সমাপ্তি তা নির্ধারণ সুকঠিন। এটাই বৌদ্ধ ধর্মের অনিত্যবাদ, যা অনিত্য তাই দুঃখ। সন্ততিবাদ, ক্ষণিকবাদ, সিংসার, অশাশ্বত, অস্থির, চিরচঞ্চল বলে এটাই অনাত্মবাদ।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে চট্টগ্রামনিবাসী বাংগালী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য চাটিলপাদ একটি চর্যায় লিখেছিলেনঃ

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দু আন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী।।
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।

পারগামী লোঅ নিভর তরই।।
ফাড়িঅ মোহতরু পটি জোড়িঅ।
অদঅ দিঢি টাঙ্গী নিবাণে কোড়িঅ।।
সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।
নিয়ড়্ডী বোহি দুর মা জাহী।।
জই তুম্‌হে লোঅ হে হোইব পারগামী।
পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তরসামী।।

এই চর্যার আধুনিক বাংলানুবাদ হচ্ছে এইঃ ....

বর্তমান চর্যাটিতে প্রাচীন মৌলিক বৌদ্ধধর্মের প্রতিধ্বনি রয়েছে সুস্পষ্টভাবে। ভবনদী গহণ গম্ভীর, অতি বেগে প্রবাহিত। দুই তীর কর্দমাক্ত, গমনাগমন দুঃসাধ্য। মাঝে থই নেই। প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে দেখা যায়-জীবন প্রবাহকে নদীর জলপ্রবাহের বা কালপ্রবাহের সাথে উপমিত করা হয়েছে। নদীর প্রবাহের মধ্যে যেমন পূর্ব মুহূর্তের প্রতি জল-কণা হতে পরবর্তী জল-কণা পৃথক, অথচ একটি অখণ্ড প্রবাহের প্রতীতি জন্মায়, তেমনি জীবের জীবন প্রবাহ অনিত্য, নিত্য পরিবর্তনশীল; কিন্তু প্রতীতি জন্মায় যেন এক, অভিন্ন ও অখণ্ড জীবন প্রবাহ।

ভবনদী বলতে আমরা ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগ, অবিরাম সংঘর্ষ নামক কর্ম প্রবাহকে ধরে নিতে পারি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মনেন্দ্রিয় এবং ইহাদের অবলম্বন বা বিষয়বস্তু হল-রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ভাব বা কল্পনা। ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সম্পর্ক প্রতিক্ষণিক। তাতে ফাঁক নেই, বিরাম নেই। এই প্রবাহ অবিরত। এটাই সিদ্ধাচার্যের চর্যায় বর্ণিত ভবনদী বা জীবনধারা। ইন্দ্রিয় ও বিষয় নামে দুই তীর যাকে মৌলিক বৌদ্ধশাস্ত্রে বলে আয়তন। এই আয়তন লোভ, দ্বেষ, মোহ পঙ্কে পঙ্কিল। অবিরত গতিশীল ভব নদীর মাঝে কোন ঠাঁই নেই। এটা অতল অপর অঠাঁই। লোভ-দ্বেষ-মোহ মলিন জীবকুল অকূল পাথারে সর্বক্ষণ 'ভাসিয়া ডুবিয়া ভাসিয়া ডুবিয়া' চলছে হাবুডুবু খাচ্ছে। অশান্ত অনর্গল দুঃখের উত্তাল তরংগে তরংগিত।

সিদ্ধাচার্যের সাঁকো হচ্ছে - সাধনা। সাঁকো নির্মাণের প্রণালী হচ্ছে - সাধনার প্রভাবে লোভ দ্বেষ-মোহরূপ তরুকে কেটে ফেলে পার্ট পার্ট করা অর্থাৎ মোহজাত লোভ-দ্বেষ মোহের বিনাশ সাধন করা। লোভ-দ্বেষ মোহের বিনাশ সাধনের বিনিময়ে যে অলোভ অদ্বেষ অমোহরূপ জ্ঞান, অদ্বয় দৃষ্টি, সাম্য ভাব বা প্রজ্ঞার উদ্ভব হবে, তাতেই নির্বাণ গমনের পথ সুগম হয়ে যাবে। প্রজ্ঞাই নির্বাণের মূল নিদান।

সিদ্ধাচার্য চাটিলপাদ সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেনঃ আমার সাঁকোতে আরোহণ করলে কেউ যেন ডান-বাম না করে, ডানে বা বামে পা ফেললে ভব নদীর অতল তলে তলিয়ে যাবে। এইক্ষেত্রে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের মধ্যপন্থার সুস্পষ্ট ইংগিত আছে। তথাগত বুদ্ধ

বলেছেন,-চরম কৃচ্ছ্রতা, দৈহিক উদ্ভট সাধনা কিংবা অবিদ্যা মোহমূলক ভোগ বিলাস-উভয় পন্থাই জ্ঞান বা যোগ সাধনার অন্তরায়। আবার অকুশল পাপময় প্রবৃত্তি কিংবা কুশল পুণ্যময় প্রবৃত্তি উভয় কর্মই জ্ঞান মার্গের পরিপন্থী, উভয় পন্থাই পরিত্যাজ্য। এতদুভয় পরিহার করে মধ্যপথ অবলম্বন করাই জ্ঞান সাধনার প্রকৃষ্ট পন্থা।

বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্র হল- অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা। এর মধ্যে বৌদ্ধধর্মের সমগ্র দর্শন প্রতিভাত। সকল বস্তুই অনিত্য, দুঃখময়, সতত পরিবর্তনশীল। মানুষ, ইতরপ্রাণী, স্থাবর, জঙ্গম এককথায় বস্তু জগৎ ও প্রাণীজগৎ- সবই প্রতিক্ষণ পরিবর্তিত হচ্ছে। জড়-চেতনের সমন্বয়ে জীবের জীবন। দেহের জড়-অংশ প্রতিনিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অগ্নিশিখার উর্ধদিকে সর্বদা স্ফুলিঙ্গের ক্ষয় হচ্ছে আর সলিতা ও তৈল হতে নিত্য নূতন অগ্নিকণা উৎপন্ন হয়ে তা পূর্ণ করে। তজ্জন্য আমাদের নিকট একই শিখার প্রতীতি জন্মে। দেহের উপাদানগুলো প্রতি মুহূর্তে শ্বাস-প্রশ্বাসে ক্ষয় হয়। পর মুহূর্তে কর্ম, চিত্ত, ঋতু ও আহার নিত্য নূতন উপাদান সরবরাহ করে তা পূর্ণ করে। মানসিক অবস্থার পরিবর্তন এত ক্ষিপ্রতর, যার সাথে উপমা ইহ জগতে মিলে না। এই যে দেহ-মনের ক্ষণিক পরিবর্তনশীলতা তাহা কার্য-কারণ নীতি সাপেক্ষ। কারণ ছাড়া কার্য হয় না, আবার কার্য ছাড়াও কারণ হয় না। এই জগৎ কার্য-কারণ সমন্বিত। জড়-চেতনময় জগৎ উৎপত্তি স্থিতি-বিলয়ের সমন্বয়। সত্তার অস্তিত্বই ক্ষণস্থায়ী। পূর্ববর্তী বীজ ও সহকারী কারণযুক্ত বীজ এক নহে। এক না হলে প্রথমের পরিবর্তনেই দ্বিতীয়ের সূচনা। এরূপে জড়-জগৎ ও মনোজগতের সকল কিছুই অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর, নিত্য পরিবর্তনশীল। পাশ্চাত্য দার্শনিক হেরাক্লিটাস বৌদ্ধধর্মের এই জীবন-প্রবাহ বা সন্ততিবাদ, গতিবাদ, ক্ষণিকবাদকে স্বীকার করে বলেন- "তুমি নদীর একই জলে দুইবার অবগাহণ করতে পারনা। কারণ নিত্য নতুন জলের স্রোত এসে তোমার দিকে প্রবাহিত হচ্ছে"। কান্ট বলেন- "প্রতিদিনই নতুন সূর্যের উদয় হয়"। এ বিশ্ব জগৎ দীপশিখা ও নদীস্রোতের সহিত উপমিত হয়েছে।

বলাকা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে যখন ঝিলম নদীতে বজরা অর্থাৎ কারুকার্য খচিত এবং বহু কক্ষসমন্বিত একটি মনোরম বৃহৎ নৌকায় অবস্থান করছিলেন, তখন একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে কবি নৌকার ছাদে উপবেশন করেছিলেন। অমনি তাঁর চোখে পড়ল ঝিলম নদীর অবিরাম প্রবাহিত স্রোতের উপর অবিশ্রাম স্রোতধারার উপরিভাগে ভেসে আসা ঝরা পত্রপল্লব, তারা-ফুল আরো কত কিছু প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সেই সময় কবির মাথার উপর দিয়ে একঝাঁক হংস-বলাকা আকাশ মার্গে উড়ে যাচ্ছিল। কবি লক্ষ্যকরলেন- ধরণীতলে অবিরত নদীর স্রোত, উর্ধ গগনে লক্ষ্য করলেন হাজারো হংস বলাকার পংক্তির

হিমালয়ের মানস সরোবর প্রদেশের দিকে নিরবচ্ছিন্ন গতি। ঝিলমনদীর গতিধারা ও মহাশূন্যে হংস বলাকার গতিশীলতা একই পর্যায়ভুক্ত। তদ্দর্শনে কবিগুরুর অন্তরে ভাব তরংগের সৃষ্টি হল। তখন যে ভাব ভাষা তাঁর মুখ থেকে বের হল-তা-ই 'বলাকা' নামের কবিতারূপে আখ্যায়িত। ১৩২২ সালে কার্তিক মাসের সবুজ পত্রে বলাকা শিরোনামে কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

শত সহস্র হংস বলাকার পংক্তি যখন আকাশ মার্গে তোরণহীন অতিশয় লম্বিত মালার ন্যায় দুলতে দুলতে দু'পাখায় বাতাস কেটে কেটে দক্ষিণ দিক থেকে উত্তরে মানস সরোবরের দিকে উড়ে চলে যাচ্ছিল তখন হংস বলাকার সম্মিলিত মালিকাবদ্ধ সমগ্র পংক্তির গতিচ্ছন্দ ও গতিভংগিমার মধ্যে সুস্পষ্টরূপে বিশ্বরূপ কবিগুরুর ভাব-তরংগে প্রতিভাত হয়েছিল। তিনি ঝিলম নদীর অবিরাম জল স্রোতে ও আকাশ-গংগায় বলাকার চঞ্চলনৃত্য গতির পাদবিক্ষেপে দর্শন করলেন,-এ বিশ্ব চরাচরের শাশ্বত সংবিধান-অনিত্য, নিত্য পরিবর্তনশীল গতিশীলতা। ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল গতি, নিত্য প্রবহমান সন্ততি, প্রবাহ, যার বিরাম নেই গতিরোধ নেই। এই গতি যেমন মহাশূন্যে তেমনি মৃত্তিকাময় মহা পৃথিবীর সর্বত্র। কি জীব জগতে, কি জড় জগতে এমন কোনরূপ ধাতু নেই-যা নিত্য, শাশ্বত, স্থির গতিহীন, অচঞ্চল, অটল, যা অচ্ছেদ্য অক্লেদ্য, অদাহ্য গুণযুক্ত।

সাত মাসের দ্বারিকা মোহন সিংহ আর আজ সাতাশি বছরের জ্যোতিঃপাল মহাথের-সুদীর্ঘকাল সীমার মাঝে বিচিত্রভাবে বিভিন্ন স্বরূপ যে দৈহিক অবস্থান বা পরিবর্তন তা কি সাতাশি বছরের ক্ষণ বিশেষের হঠাৎ পরিবর্তন। তা কি এক-না-ভিন্ন। এই প্রশ্নের জবাবে যদি আসে এক-তাও ভুল। বৌদ্ধ মতবাদে উহা শাশ্বত নামক মিথ্যাদৃষ্টি। আবার যদি জবাবে আসে এক নয় ভিন্ন তাও ভুল। ইহা উচ্ছেদ নামক মিথ্যাদৃষ্টি। তবে কি ? বৌদ্ধ ধর্মের নীতি আদর্শের ভিত্তিতে সঠিক জবাব আসবে 'নচ সো নচ অঞ্‌ঞো 'সে-ও নয়, অন্য বা ভিন্নও নয়। তবে কি? ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল গতি, প্রবাহ, সন্ততিমাত্র। ইউরোপের ফরাসী দেশীয় বিখ্যাত দার্শনিক পন্ডিত বের্গসঁ এই সতত গতিবাদকে স্বীকার করেছেন, প্রচার করেছেন; কিন্তু তার গতির গম্যস্থানে আকাশের কিনারা নিরোধের কল্পনা করেননি, গতি স্তব্ধের আভাস দেননি। কবিগুরু বিশ্বময় নিরন্তর গতিশীলতাকে প্রত্যক্ষ করে উপলব্ধি করেছেন সমগ্র দর্শন এই গতিবেগে বা ক্ষণিকবাদে প্রতিভাত। তথাপি ভাবছেন এই গতিবাদই কি ঐকান্তিক, এই ক্ষণিকবাদ জীবনের সর্বস্ব? এই গতিবাদই কি চিরন্তন সত্য? না, এর পরও একটা সর্বশেষ পরণিতি আছে? যার ইংগিত বলাকায় করেছেন। এ জগতে যা কিছু সংঘটিত হয়-সবই কার্য কারণ সাপেক্ষ। কার্য-কারণ নীতি অনন্যসাপেক্ষ।

যাযাবর পাখীর ঝাঁক অনন্ত আকাশ-গংগার পথে উড়ন্তাবস্থায় কবিগুরুর উপলব্ধিতে এলো জগতের সমস্তই যাযাবর চলিষ্ণু। মনোজগৎ ও জড়জগতের সব কিছুর মধ্যে সঞ্চিত আছে চঞ্চল গতির আবেগ, যে গতিবেগ কবিগুরু আজীবন বিভিন্ন কাব্য-কবিতায় বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ করে এসেছেন। বস্তুতঃ এ জগতে এমন কিছু নেই যাতে গতিশীলতা

নেই। যা বৌদ্ধ ধর্মাদর্শে ক্ষণিকবাদ, সন্ততিবাদ, প্রবাহ পরিক্রমা-তা-ই কবিগুরু ঝিলম নদীর নিরবচ্ছিন্ন স্রোতে ও মহাশূন্যে উড়ন্ত হংস বলাকার ঝাঁকে পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি করেছেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন- নদীর স্রোতধারায় ও হংস বলাকার গতিধারায় বিশ্বরূপ, এটা বিশ্বের প্রতিচ্ছবি, বিশ্বের প্রতীক। তিনি চরম গতির পরিণতির আভাস প্রদানে কবিতায় বলেছেনঃ

এ সন্ধ্যায় স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি,
সুদূরের লাগি,
হে পাখা বিবাগি।
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে
হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোনখানে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক দার্শনিকগণ যেমন বলেন, এই জীবজগৎ ও বস্তুজগৎ কার্য-কারণ সমন্বিত একটা প্রবাহমাত্র, তেমনি বলেন এই বিশ্ব চরাচর অনিত্য, গতিশীল। এই গতি বস্তুর একটা অবস্থা মাত্র। বস্তু ও স্থান কালের সম্পর্ক মাত্র গতি নয়, গতি এক স্থিতি হতে অপর স্থিতির পরিণতি মাত্র নয়, যেহেতু কাল অবিভাজ্য, অনাদি অনন্ত। বস্তুত কালে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান নেই। সুতরাং স্থানও অনন্ত। কেবলমাত্র বস্তুর সাথে বিশেষ সম্পর্কে কাল ও স্থানকে প্রবিভক্ত বলে মনে হয়। বস্তুর গতিতেই আমাদের কল্পনায় স্থান ও কালের জ্ঞান জন্মে।

কবিগুরু এই অনিত্যবাদ, গতিবাদ বা সন্ততিবাদকে বিশ্বের শাশ্বত সত্য বলেই ক্ষান্ত হননি। এই গতিতে ক্লান্তি আছে, দুঃখ-কষ্ট আছে, অতৃপ্তি অনুভূতি আছে। তার থেকে অব্যাহতি লাভের আনন্দ লোকের সন্ধান আছে। তিনি জীবনের উদ্দেশ্য, গতির লক্ষ্য, পরিণতির নির্দেশ দিয়েছেন। কেবল গতিতে মানুষের চরম প্রাপ্তি নেই। শুধু গতিই যদি চরম ও পরম হয়, চিরন্তন সত্য, শাশ্বত বিধান হয়, তবে তা দুঃখের সাথে সংগ্রামই সার। ভবাগ্রে উড়াই বৃথায় পর্যবসিত।

মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে।

তবেতো সবই পণ্ড। পাশ্চাত্য দার্শনিক বৈজ্ঞানিক জড়-বিশ্ব ও প্রাণী-বিশ্ব দু'য়ের মধ্যেই এক অবিরাম অবিশ্রাম গতিবেগ স্বীকার করেছেন, প্রচার করেছেন সত্য; কিন্তু তা কিরূপ? তার চরম পরিণতির নির্দেশ দেননি। কিন্তু এই গতির প্রত্যক্ষরূপে স্বরূপ চিহ্নিত ও উল্লেখ না করলেও কবিগুরুর বলাকায় গতির চরম শান্তির আভাস আছে। গতির মোড় ফিরিয়ে বিপরীতমুখী হলেই আনন্দলোকে পৌছান সম্ভব। কবি বলেছেন যে, এইগতির মাঝেই বিশ্বের প্রাণ-শক্তির বিকাশ। গতি স্থগিত হলেই আবিলতা আবর্জনা জন্মে। এমনকি, মৃত্যু এসে হাজির হয়।

যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে,
সহস্র শৈবাল দাম বাঁধে আসি তারে।

যে জাতি জীবন-হারা অচল অসার,
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।
সর্বজন সর্বক্ষণ চলে যেই পথে,
তৃণগুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোনমতে।
যে জাতি চলে না কভু তারি পথ পরে,
তন্ত্র মন্ত্র সংহিতায় চরণ না সরে।

বলাকার চিত্র হচ্ছে নিতান্ত আধ্যাত্মিক পারমার্থিক। কিন্তু পূর্বোক্ত কবিতা পংক্তির বলাকার সাথে একান্ত সামঞ্জস্য থাকলেও এক্ষেত্রে সামাজিক রূপই প্রকটিত। বলাকা কাব্যে কবিগুরুর যে ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে, তা আকস্মিক নয়। এরূপ গতিচেতনার অস্তিত্ব ও আকুল আকুতি পূর্ব পূর্ব বহু কাব্যে কবিত্বে বরাবরই প্রকাশ পেয়েছে। বলাকায় তার পুনার্ভিব্যক্তি লাভ করেছে।

এক্ষেত্রে একটা যুক্তির অবতারণা অপ্রাসংগিক হবে না যে, বৌদ্ধদর্শনের রূপপরিচ্ছেদে জড় জগতের আটাশ প্রকার রূপের মধ্যে পৃথিবী ধাতু, আপ ধাতু, তেজঃ ধাতু ও বায়ু ধাতু- এই চার প্রকার মহাভূতের কথা উল্লেখ আছে। আরেকটি মহাভূতের কথা উল্লেখ আছে-তা হচ্ছে ব্যোম বা আকাশ। বৌদ্ধদর্শনে এটাকে পরিচ্ছেদ রূপ বা আকাশ ধাতু বলা হয়েছে। কিন্তু এটাকে মহাভূতের অন্তর্গত করা হয়নি। কারণ পরিচ্ছেদরূপ সান্তরতারই অন্য নাম। এই সান্তরতা বা সচ্ছিদ্রতাই আকাশ ধাতু। পদার্থ যতই অণু, পরমাণু বিশিষ্ট হোক না কেন, যতই নিরেট হোক না কেন, তা সান্তরতা বা আকাশ ধাতু বর্জিত হতে পারে না। এই গুণ আছে বলে পদার্থকে ছেদ করা যায়, ভংগ করা যায়, কাটা যায়। এটা যেমন বালুকাস্তুপের মধ্যে, তেমনি বালুকাকণার মধ্যেও বর্তমান। অতএব, সমগ্র জড় জগৎ ও জীব জগৎ আকাশের উপর স্থিতিশীল, গতিশীল। কিন্তু আকাশ কোন কিছুর উপর স্থিতিশীল বা গতিশীল নয়। আকাশ সর্বতোশূন্য। হংস বলাকা যেমন পাখা সম্প্রসারিত করে মহাশূন্যে বায়ু কেটে কেটে চলছে, তাতে মহাশূন্য শব্দায়মান হয়ে উঠেছে, তেমনি জড়জগৎ ও প্রানীজগৎ ক্ষণে ক্ষণে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে আকাশ ধাতুতে প্রবহমান। তাতে স্থানাবরোধকতা ও কালাবরোধকতা সৃষ্টি করছে। এই গতিশীলতার স্থির স্তব্ধতার নির্দেশ না থাকলেও নিরোধের সুনির্দিষ্ট সম্ভাবনার আভাস আছে। এই আভাস কি ইহলোকে, না পরলোকে, না অন্তর জগতে? এজন্য বলাকা কবিতায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ

ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে,
হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।

বস্তুত কবিগুরু তাঁর কবিজীবনের সকল ক্ষেত্রেই, সকল কাব্য কবিত্বেই, সকল সাহিত্যেই চরম সীমার ইংগিত দিয়েছেন। সংকীর্ণ নীড় হতে আকাশে, মোহ হতে প্রজ্ঞায়, অন্ধকার হতে আলোকে, দুঃখময়তা থেকে সুখময়তায়, প্রবৃত্তি রাজ্য থেকে নিবৃত্তি রাজ্যে,

সান্ত থেকে অনন্তে, সসীম থেকে অসীমে পরিণতি লাভের আভাস দিয়েছেন। শাস্ত্রীয় আলোচনা গবেষণার মাধ্যমে তথ্য তত্ত্ব সারমর্ম যেমন বের করা প্রয়োজন তেমন কবিগুরুর কাব্যে কবিত্বে সাহিত্যে অধিকতর বিষয়বস্তু আছে-যা গভীর মনোনিবেশ সহকারে গবেষণা করে বের করা উচিত।

চর্যাপদ ও সোনারতরী

মৌলিক বৌদ্ধধর্মের নীতি আদর্শে আছেঃ

দুক্‌খমেব হি ন কোচি দুক্‌খিতো
কারকো ন কিরিয়া বিজ্জতি,
অত্থি নিব্বুতি ন নিব্বুতো পুমা
মগ্‌গমত্থি গমকো ন বিজ্জতি।

দুঃখ জগৎজোড়া চিরবিদ্যমান। কিন্তু দুঃখগ্রস্ত কোন ব্যক্তি জগতে চিরস্থায়ী থাকে না। সর্বং অনিত্যম্। নিরন্তর ক্রিয়া আছে; কিন্তু কারক বলতে জগতে কেউ স্থায়ী হয় না। নির্বাণ চিরন্তন সত্য। কিন্তু নির্বাণপ্রাপ্ত কোন পুরুষ বিদ্যমান নেই। মার্গ চিরকালব্যাপী বিদ্যমান; কিন্তু মার্গগামী লোক জগতে নেই। এটা জগতের শাশ্বত ধর্ম। এই জগতে দুঃখ ছাড়া কিছু নেই। মোহজ ইন্দ্রিয়জ সাংসারিক সুখ বলে মানুষ যাকে কল্পনা করে, তাও আপাতদৃষ্টিতে দুঃখ না হলেও দুঃখ সত্যের অন্তর্গত। যেহেতু তাও কামনা বাসনাজনিত কল্পনামাত্র। পরিণতিতে দুঃখ। জগতের স্বাভাবিক অবস্থাই দুঃখময়।

বার্মাদেশে এক বিহারে এক ভিক্ষু চার প্রকার দুঃখ সত্য সম্পর্কে সভায় বক্তৃতা করলেন। দুঃখ কি? দুঃখের কারণ কি? দুঃখ নিবৃত্তি কিরূপ। দুঃখ নিবৃত্তির উপায়-বা কি, ইত্যাদি।সভায় ছিল বোম্বাই প্রদেশের পঁচিশ বছরের এক সটান যুবক। ভিক্ষুর বক্তৃতায় যুবক বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি এত দুঃখের বর্ণনা করলেন, আমারতো কোন দুঃখ নেই। আপনি আমাকে এক্ষণ দুঃখ দেখাতে পারবেন? ভিক্ষু বললেনঃ বাপু, তুমি আমার কাছে এস এবং এই কুশাসনে খুব আরামের সাথে বস। তোমার সাথে একটিমাত্র ওয়াদা রইল। তুমি আমার অনুমতি ছাড়া একটুও নড়াচড়া করতে পারবে না। আসন ত্যাগ করে উঠতে পারবে না। যুবক ভাবল-এ আবার কি কথা- বলে আরামের সাথে বসে গেল। কয়েক মিনিট পর দেখা গেল, যুবক আর বসে থাকতে পারল না। তার উরুদেশ ও কোমরের নিম্নদেশে ভীষণ ব্যথা বেদনার সৃষ্টি হল। সে আর সহ্য করতে পারল না। উঠে পড়ার জন্য বারবার ভিক্ষুর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করল। ভিক্ষু বললেন-আর একটু, আর একটু। অবশেষে অনুমতি পাওয়ার আগেই উঠে পড়ল। যুবক তখন হতবাক। আর কিছু বলে না। একেবারে নীরব, নিস্তব্ধ। ভিক্ষু বললেন-বুঝেছ বাপু, জগতের স্বাভাবিক অবস্থাই দুঃখময়। জীব অবস্থানের পরিবর্তন করে ক্ষণে ক্ষণে সুখের সন্ধান করে মাত্র।

শয়ন, উপবেশন, দাঁড়ান ও গমন- দেহের এই চার প্রকার বিন্যাসকে শাস্ত্রীয় পারিভাষিক ভাষায় বলে চার ঈর্যা পথ। জীব এই চারি ঈর্যা পথের যে কোন একটিতে জীবন কাটায়। অধিকক্ষণ শয়নে ব্যথা আরম্ভ হলে পাশ পরিবর্তন করে ব্যথার উপশম করে। অতঃপর উপবেশন করে। উপবেশনে অনেকক্ষণ অবস্থান করলে ব্যথা বেদনার সৃষ্টি হয়। তখন দণ্ডায়মান হয়। তাতেও বেশীক্ষণ শান্তি নেই, দুঃখানুভূতি আসে। সেই দুঃখানুভূতি লাঘবের জন্য হাঁটাহাঁটি আরম্ভ করে। গমনাগমনে কিছুক্ষণ থাকলে এতেও অশান্তি আসে। এইভাবে জীব সর্বক্ষণ ঈর্যা পথের পরিবর্তন করে দুঃখের লাঘব বা শান্তির সন্ধানে থাকে। বস্তুত এ জগতে শান্তি সুখ কোন অবস্থানেই পাওয়া যায় না। ইহা জগতের শাশ্বত বিধান। জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম দুঃখময়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মের বারশত বছর পূর্বে অর্থাৎ ৭ম-৮ম শতকে উড়িষ্যার বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য যাঁর নাম ছিল কম্বলাম্বর তিনি এক চর্যা লিখেছেন। তাঁর চর্যার প্রথম ছত্র হলঃ

সোনে ভরতী করুণা নাবী,
রূপা থোই নাহিকো ঠাবী।

করুণার নৌকা সোনায় ভরনীয়। রূপা রাখবার স্থান তাতে এক বিন্দু নেই। মহাকরুণার নৌকা অতিশয় সূক্ষ্ম, নিরক্ষর, নিরঞ্জন, নিরাকার। সাধনার প্রভাবে যখন প্রজ্ঞা উৎপত্তি ঘটে, তখন প্রজ্ঞার সাথে এটার জমজভাই সদৃশ সহজাত ধর্ম মহাকরুণার সংযোগ ঘটে। প্রজ্ঞা ও মহাকরুণা সহজাত চৈতসিক বা মনোবৃত্তি। পরস্পর সাপেক্ষ। প্রজ্ঞা ব্যতীত করুণা নিরর্থক। আবার করুণা ব্যতীত প্রজ্ঞা অপ্রকট, অনভিব্যক্ত। উভয়ের সমন্বয়ে সোনায় সোহাগা।

সিদ্ধাচার্য ঢেন্ডনপাদ এক চর্যায় বলেছেনঃ–

টালত মোর ঘর, নাহি পড়বেশী,
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।

আধুনিক বাংলা ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদ করলে ইহার অর্থ দাঁড়ায়- এক ডোমনী মেয়ে বলছেন- টিলার সর্বোচ্চ শিখরে আমার ঘর বা বসতি। আমার প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই, অথচ নিত্য অতিথির সমাগম।

ইহার সামাজিক ও আধ্যাত্মিক রূপ হচ্ছে এই- হাঁড়ি, ডোম, মুচি, মেথর প্রভৃতি নীচ জাতি সামাজিক সম্পর্কে ঘৃণিত, নিন্দিত, অবহেলিত, ধরা ছোঁয়ার বাইরের লোক, এজন্য এদের বাসস্থান, ঘর-বাড়ী উচ্চ বর্ণাশ্রিত সভ্য, ভদ্র, শিক্ষিত ভদ্র লোকের থেকে দূরে, নগরের বহিরস্থ জনপদে। এরা অপাংক্তেয়। এদের নিকটবর্তী প্রতিবেশীরূপে কেউ বাস করতে চায় না। এরা অস্পৃশ্য। ডোমনী মেয়ে অন্য কেউ নয়। স্বয়ং প্রজ্ঞাদেবী। যখন মানুষ কঠোর সাধনার প্রভাবে অবিদ্যা মোহ, তৃষ্ণা, আসক্তির তাড়না, হিংসা ক্রোধের উত্তেজনা

থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে প্রজ্ঞা লাভের অধিকারী হন, তখন তাঁর এ প্রজ্ঞা সকল সামাজিক গুণ থেকে সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করে। সাধারণ লোকের বিদ্যাবুদ্ধির বহির্ভূত। উপলব্ধির অনধিগম্য। নাগালের বাহিরে। প্রজ্ঞার সমকক্ষ, সমধর্মী, সমমর্মী কোনরূপ মানব-মহিমা জগতে নেই। প্রজ্ঞা সর্বশ্রেষ্ঠ। এজন্য বলা হয়েছে টিলার সর্বোচ্চ শিখরে আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই। প্রজ্ঞালাভী ব্যক্তির জীবনে কুশল অকুশল কর্মের প্রেরণা নেই। যে কুশলাকুশল কর্ম পুনর্জন্মের হেতু, জীবনে সুখ-দুঃখ ভোগের কারণ, জন্ম-মৃত্যুর নিদান তা প্রজ্ঞালাভীর জীবন থেকে সমূলে উচ্ছিন্ন হয়। পুনরুদগম শক্তি রহিত হয়ে যায়। এজন্য সিদ্ধাচার্য বলেছেন- হাঁড়িতে ভাত নেই। জীবনপ্রবাহে প্রজ্ঞা প্রচ্ছন্নশক্তি। অপ্রকট, অনভিব্যক্ত, প্রজ্ঞার সহযোগী, সহজাত, সহোৎপন্ন ধর্ম হচ্ছে- মৈত্রী করুনা। মৈত্রী করুণা ব্যতীত প্রজ্ঞার বহির্বিকাশ নেই। প্রজ্ঞার সর্বক্ষণ সাথী সহচর ধর্ম মৈত্রী করুণা না হলে প্রজ্ঞা দৃশ্যমান হয় না। মৈত্রী করুণা সহযোগী হলেই প্রজ্ঞা দৃশ্যমান সপ্রকট হয়। সপ্রজ্ঞ ব্যক্তি যখন বহু জন হিতায়, বহু জন সুখায় জনগণ মধ্যে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন, তখন প্রজ্ঞার সাথে মৈত্রী করুনা সংমিশ্রিত ধর্মরূপে সহগমন করে। নিতি আবেশী অর্থ নিত্য আত্মীয় সংসর্গিত, পরিবেষ্টিত।

অবিদ্যা মোহ, কাম-ক্রোধাদি অকুশল সমন্বিত জগৎ প্রপঞ্চ হচ্ছে-প্রবৃত্তি রাজ্য। প্রজ্ঞা শাসিত মৈত্রী করুনা, শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্য, সমাধি হচ্ছে নিবৃত্তি রাজ্য। প্রবৃত্তি রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক নিবৃত্তি রাজ্যে গমন করাই বুদ্ধের ধর্ম। এখানে প্রবৃত্তি রাজ্য সম্পর্কিত একটি বাস্তব গল্প প্রণিধানযোগ্যঃ

ভারতীয় একজন সন্ন্যাসী আমেরিকায় বহু দেশ ভ্রমন করে এক শহরে এক হোটেলে উঠলেন। হোটেলের জানালা দিয়ে অবিদূরে একটি মাটির স্তূপ তাঁর চোখে পড়ল। স্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে এক মহিলা পাখা হস্তে মাটির স্তূপটি পাংখা করছে। এই দৃশ্য সন্ন্যাসী ঠাকুর দিনেও দেখলেন, সারা রাত্রিও দেখলেন। রাত্রি প্রভাতেও দেখলেন মহিলার অবিরাম পাংখা কর্ম চলছে। তাতে বিরাম নেই। সন্ন্যাসী ঠাকুর আগ্রহ ভরে প্রাতরাশের পর মাটির স্তূপের নিকট হাজির হলেন এবং মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, ভদ্রে! আপনি সারা দিবা-রাত্রি এই মাটির স্তূপ পাংখা করছেন কেন? আমি তার তত্ত্ব কিছু বুঝতে পারি নি। মহিলা বললেন- কিছু দিন পূর্বে আমার স্বামী মারা গিয়েছেন। তাঁকে এই বালির স্তূপে কবর দেওয়া হয়েছে। কবর দেওয়ার প্রাক্কালে মজবুত করার মানসে বালিকাময় মাটিতে প্রচুর জল সিঞ্চন করা হয়েছে। স্তূপটা এখন ভিজা। সন্ন্যাসী ঠাকুর বল্লেন- অহো! আপনার ন্যায় পতিব্রতা, সতী সাবিত্রী-নারী দুনিয়ায় আর দেখিনি। মৃত স্বামীর কবর খোলায় অবিরাম এভাবে সেবাকর্মে নিযুক্তা। জীবিতকালে আপনি যে কিরূপ পতিব্রতা ছিলেন। বড় আশ্চর্য! সন্ন্যাসী ঠাকুর আবার জিজ্ঞেস করলেন, ভদ্রে! আমি এখনো ঠিক ঠিক বুঝতে পারি নি। ইহার হেতু- প্রত্যয় কি ? মহিলা জবাবদিলেন, মহাশয়! আমেরিকান খৃষ্টান সমাজে একটা রীতি আছে, কারো স্বামী মারা গেলে যেস্থানে মৃতদেহ কবর দেওয়া হয় সেই স্থানটা না শুকান পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির

স্ত্রী পুনরায় স্বামী গ্রহণ করতে পারে না। এজন্য আমার এ প্রয়াস। তগুবনে সন্ন্যাসী ঠাকুর ভাবলেন- হায়রে দুনিয়া। প্রবৃত্তির মর্মন্তুদ পরিহাস। বাসনার বশে প্রবৃত্তির কী সাধনা? এই মহিলা তো একক নহেন, তিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিচ্ছবি, প্রতিনিধি।

কবিগুরু যখন শিলাইদহে পদ্মা নদীর বোটে বাস করছিলেন, তখন চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ল-জলভারনত আকাশে কালোমেঘ। পদ্মার পরপারে ছায়াঘন বৃক্ষরাজির মধ্যে বহুগ্রাম। জল প্লাবনে পরিপূর্ণ পদ্মা খরস্রোতে অবিরাম অবিশ্রাম গতিতে প্রবাহিত হয়ে চলছে। মাঝে মাঝে জলস্রোত পাক খেয়ে জল বুদ্‌বুদের সৃষ্টি করছে। আবার বিলীন হয়ে যাচ্ছে। নদীর অকাল প্লাবন চরের ধান ডুবিয়ে দিচ্ছে। চাষীরা তাড়াহুড়া করে কাঁচা ধান তাদের ডিংগি ভর্তি করে হু হু করে নদীর স্রোতের উপর দিয়ে নিজ নিজ আলয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এসব দৃশ্যেই কবির অন্তরে ভাবতরংগের সৃষ্টি হল। কবি এই দৃশ্যের মধ্যেই বিশ্বরূপ, বিশ্বের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পেয়েছেন। এটাই সোনারতরী কবিতার উৎস। "সকলের তরে সকলে আমরা"-এটা সামাজিক সূত্র। সমাজে মানুষ মাতা-পিতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, আত্মীয় পরিজন নিয়ে বসবাস করে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে বাহ্যিকরূপে সুখ-দুঃখে সহানুভূতিশীল।.কিন্তু আধ্যাত্মিকরূপে এই জগতে কেউ কারো নয়। অপ্রত্যাশিতভাবে কে কোথা থেকে এসেছে, পরোক্ষভাবে কোথায় যাবে? কার কিরূপ নিয়তি, জীবনের সুখ-দুঃখ ভোগাদি বা কার কিরূপ, কারো সম্পর্কে কিছু বলার কারো সাধ্য নেই। অসংখ্য জীবকুলের একজন সদস্য আমি। এই বিশ্ব জগতের তুলনায় প্রত্যেকের জীবন ক্ষুদ্র একটি বিন্দু বিশেষ। অন্যের সাথে এই বিন্দু সম্পর্কহীন। সম্পূর্ণ একক। দোসর বলতে জগতে কেউ নেই। একের দৃষ্টিতে এ জগৎটা যেরূপ, অন্যের দৃষ্টিতে সেরূপ নয়। একেবারে অন্য, সম্পূর্ণ ভিন্ন। বৌদ্ধশাস্ত্র বলে একেক ব্যক্তি, একেক জন-একেকটি জগৎ। যত জন তত জগৎ। বাহ্যিকভাবে সম্পূর্ণ হুবহু দুই ব্যক্তি যেমন জগতে বিরল, আধ্যাত্মিকরূপেও মন মানসিকতা, কর্মকাণ্ডে পরস্পর বিসদৃশ। এজন্য কবিগুরু সোনারতরী কবিতার প্রথমেই বলেছেনঃ

একখানি ছোট খেত, আমি একেলা,

অনাদি-অনন্ত কালগর্ভে, অনন্ত বিস্তারিত ক্ষিতি, অপ, তেজঃ মরুৎ ও ব্যোমের মাঝে অহং একটি বিন্দু বিশেষ। এই বিন্দু অনিত্য, গতিশীল, দুঃখগ্রস্ত, অনাত্মা। যে কোন মুহূর্তে অনন্তে বিলীন হয়ে যেতে পারি। সংগী, সাথী, সহচর, সহজাত, সহযোগী কেউ নেই বলে অহং ভয়ে বড় ভীত। এজন্য অহং সোনার তরীর নেয়ে মহাকালকে আহবান জানালেমঃ কবিগুরু নিজেই মহাকালকে সোনার তরীর নেয়ে বলেছেন। অহং মহাকালকে অনুরোধ করলামঃ

শুধু তুমি নিয়ে যাও ক্ষণিক হেসে,
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে।

মহাকাল প্রবাহিত হয়ে চলছে। অহং তার কাছে নিজের সমস্ত কৃতকর্ম, যশঃকীর্তি সমর্পণ করলাম। মহাকাল সবকিছু গ্রহণ করে কাল হতে কালান্তরে, দেশ হতে দেশান্তরে

বহন করে নিয়ে যেতে রাজী। এককণাও ফেলে যাবে না। সব রক্ষা করবে। কিন্তু কোন কারক, কীর্তিমান পুরুষ, যশস্বী ব্যক্তিকে গ্রহণ করবে না, ভৌতিক কোনরূপ কিংবা দৈহিক কণাকে বহন করবে না। অহং তখন তবু আশান্বিত হয়ে মহাকালকে অনুরোধ করে বললাম- আমার সোনার ধানগুলো নিয়ে যাও। মহাকাল বলল-

যত চাও তত লও তরণী পরে
আর আছে ?- আর নাই, দিয়েছি ভরে
এতকাল নদী কূলে-যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলই দিলাম তুলে থরে বিথরে-
এখন আমাকে লহো করুণা করে।।

সোনারতরী বা মহাশূন্যতার তরণীতে অনন্ত অফুরন্ত স্থান। কীর্তিমানের কর্মকীর্তি, যশস্বীর নাম যশ, দার্শনিকের দর্শন, ধর্মপ্রবক্তার ধর্ম, ঐতিহাসিকের ইতিহাস যত ইচ্ছা তত তুলে দাও। অহং সবই তুলে দিলাম আর কিছু বাকী রাখিনি। কিন্তু অনিত্য জীবন দুঃখের সর্বশেষ গন্তব্যস্থান নদীর কূলরূপ জীবন চারণভূমিতে অবস্থান করে অনিত্য সংসার কুঞ্জের নিত্যবশে আমিত্ববোধে প্রমাদবশে আজীবন যে ফসল উৎপাদন করলাম আজ তা সবই সারিবদ্ধভাবে মহাকালের সোনারতরীতে বোঝাই করে দিলাম। যখন অহং মহাকালকে অনুরোধ করে বললাম-এইবার আমাকে দয়া করে লও। মহাকাল জবাব দিল-না- তোমার জন্য স্থান নেই সোনার তরীতে।

ধর্মপদ গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে–

অপ্‌পমাদো অমত পদং, পমাদো মচ্চুনোপদং।

তথাগত বুদ্ধ প্রতিদিন ভিক্ষু সঙ্ঘকে ধর্মোপদেশ প্রদান সমাপ্ত করে যখন গন্ধকুটিরে গমন করতেন তখন ভিক্ষু সঙ্ঘ গন্ধ কুটির পর্যন্ত তথাগতের পশ্চাদানুসরণ করতেন। করুণাঘন বুদ্ধ গন্ধকুটিরে ঢুকার প্রাক্কালে পাদপীঠে দাঁড়িয়ে ভিক্ষু সঙ্ঘের দিকে অবলোকন পূর্বক বলতেন, হে ভিক্ষুগণ! জগতের সব কিছু অনিত্য। নিত্য বলতে কিছু নেই। তোমরা যা কিছু কর, অপ্রমাদের সহিত সম্পাদন কর। অপ্রমাদ অমৃত বা পরমা শান্তি নির্বান লাভের উপায়। প্রমাদ জগৎ প্রপঞ্চ, মৃত্যুর পথ। অপ্রমাদ হচ্ছে- ভুলে না যাওয়া, সতর্কতা, উদ্যোগ, সৎকর্মে উৎসাহ, স্থিতিশীলতা, অবিরাম স্মৃতি, বিদর্শন। অপ্রমাদই বৌদ্ধধর্মের সার নির্যাস। আর প্রমাদ হচ্ছে- ভুলে যাওয়া, প্রমত্ততা। অনবধানতা, অসাবধানতা, ধর্মজীবনে বিস্মৃতি, বিষয় ভোগে নিমগ্নতা, অকুশল কর্মে উৎসাহ, অস্মৃতি, বিস্মৃতি। সুতরাং যত দিন মানুষ অপ্রমাদের সাধনার প্রভাবে উন্নত স্তরে উপনীত না হবে, ততদিন মানুষ এ জগৎ জীবনে যা কিছু করে সবই প্রমাদ বা ভুলের অন্তর্গত। এই সমগ্র জগতটা নদীর কূল বা শ্মশানখোলা মাত্র। এ জগৎ মরণশীল। অনাদি কাল হতে মরেছে, মরছে, অনন্ত কালাবধি মরতে থাকবে। জগতের প্রত্যেকটি প্রাণী যখন মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত। তখন এই জগতটা প্রকৃষ্ট শ্মশান। এখানে

যা কিছু করা হয় সবই ভুল বা অবিদ্যা মোহের অধীন। দানাদি ধর্মপুণ্য ও জন্মমৃত্যুর অন্তর্গত। কিন্তু অপ্রমাদ জন্ম মৃত্যুর অতীত। কবিগুরু কবিতায় বললেন- জীবনের সব কিছু সর্বগ্রাসী মৃত্যুর কবলে তুলে দিলাম।

এতদিন নদীকূলে যাহা লয়ে ছিনু ভুলে

সকলই দিলাম তুলে থরে বিথরে।

মানুষ তার জড় চেতনের সমষ্টির প্রতি অহং বা আমি শব্দ আরোপ করে। আত্মা অহং এর বাচক। পালি অত্তা আর সংস্কৃত আত্মা শব্দ উভয়ই অস্মদ বা নিজ অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন সাহিত্যে এই অর্থেই অধ্যাত্ম শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু উত্তরকালে উহা জীবের জড়-চেতনের অতিরিক্ত নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, স্বতন্ত্র তত্ত্বরূপে ব্যবহার করে জটিলতার সৃষ্টি করা হয়েছে মাত্র। আ+অৎ (নিয়ত গমন করা) + মন্ প্রত্যয় দ্বারা আত্মন শব্দ গঠিত। ইহার অর্থ দাঁড়ায়-নিত্য গমনশীল। অস্থির অশাশ্বত। মহাকাল যশঃ কীর্তিকে স্বীকার করলেন। জীবনের ফসলকে স্বীকার করলেন। কিন্তু যশস্বী, কীর্তিমান কিংবা ফসল উৎপাদককে স্বীকার করলেন না। অর্থাৎ অহং, আমিত্বকে বা আত্মাকে গ্রহণ করতে বা বহন করতে মহাকাল রাজী নয়। মহাকাল গ্রহণ করবে, বহন করবে, রক্ষা করবে অনাত্মাকে। অনাত্মার প্রতিই মহাকালের স্বীকৃতি, আত্মার প্রতি নয়। মহাকালকে আমি অনুরোধ করলাম "এখন আমাকে লহো করুণা করে" আমিত্বকে চিরন্তন করে রাখতে ইচ্ছা করলাম; কিন্তু নিষ্ঠুর মহাকাল জবাব দিল,- তোমাকে নিয়ে আমার কি লাভ? তোমার জন্য সোনারতরীতে স্থান একবিন্দু নেই। তুমি যে সাকার, রূপবান আত্মা, তুমি নিরাকার নামও নও, অরূপও নও। যা অনাত্মা, নিরাকার, নিরঞ্জন সোনার তরীতে তা-ই ধরবে। এই জগতে অহং আত্মার আমিত্বকে সঠিকভাবে বুঝলাম, উপলব্ধি করলাম,- আমার সৃষ্টীয় পদার্থে, আমার সোনার ধানে তরণী ভর্তি হয়ে গিয়েছে। আমাকে ধরবে না। আমার জন্য তরণীতে স্থান নেই। অনাত্মাকে নিবে, আত্মা বা আমাকে নেবে না। তখন অহং স্বীকার করে নিলামঃ

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট সে তরী,

আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।

জীবন দুঃখের কারণ যে কামনা বাসনা এটা সকল দর্শনের সিদ্ধান্ত। বাসনার আশ্রয়স্থল আত্মার অস্মিতা বা অহং প্রতীতি। এই অহং অবলম্বন করেই কামনা বাসনা উৎপন্ন হয় ও কামমূলক ক্রোধাদি রিপু প্রবল হয়ে উঠে। অহংকার থাকলে জন্মপ্রবাহ উপশম হয় না এবং আত্মায় বিশ্বাস থাকলে হৃদয় হতে অহংকার বিদূরিত হয় না। এই অহংকার মমকার সর্ব অকুশলের নিদান, অনর্থের মূল। আত্মার অস্তিত্ব না থাকলে আত্মীয় কোথা হতে আসবে। আত্মা ও আত্মীয় ভাব শান্ত হলে অহংকার ও মমকার দূরীভূত হয়। অন্তরে বাহিরে সকল প্রকার মনোবিকার নিরুদ্ধ হয়। সেজন্য কবিগুরুর রচিত গীতাঞ্জলির সর্বপ্রথম গানে আছে,- "সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে"। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে অগস্ত্য গমনে

নদীর তীরে অহং দেখলাম নদীর তীর সর্বশূন্যতায় পর্যবসিত। জীবনের কোন চিহ্ন নেই। কোনরূপ সম্বল সম্বিৎ সেখানে নেই। তখন অন্তরে অহং বিষাদ করুণ মানসছবি চিত্রিত করে বললাম,- জীবনে আত্মা বা অহংকার বশে যা কিছু করলাম, সবই বৃথায় গেল। অহং বা আমিত্ব যেতে পারলাম না, তদ্ধেতু আত্মাকে অকালে মৃত্যুর সর্বগ্রাসী কবলে তুলে দিতে হল। তখন অহং আক্ষেপ করে বললামঃ

শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি,
যাহা কিছু নিয়ে গেল সোনারতরী।

বস্তুতঃ নিরহংকার চিত্তে জীবনের যা কিছু ফসল সযত্নে সঞ্চয় করার তা যদি যথোচিৎভাবে করা না হয়, যে পথে চলবার সে পথে যদি সংযম সাধনায় নিরত থাকা না যায়, তাহলে অন্তিম গমনের প্রাক্কালে নদীর তীরে শ্মসানে বিষাদময় নিমিত্ত নিয়ে গমন করতে হয়। এক্ষেত্রেও প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্তি, সসীম থেকে অসীম এবং মোহ থেকে প্রজ্ঞালোকে গমনের সংকেত বিদ্যমান আছে।

বৈজ্ঞানিকের মতে-এই মৃত্তিকাময় পৃথিবী আপ ধাতুর উপর প্রতিষ্ঠিত। আপধাতু আকাশের উপর স্থিত। আকাশ ধাতু বায়ু ও তেজ সমন্বিত। সিদ্ধাচার্যের সোনার তরী আর কবিগুরুর সোনারতরী অর্থ হচ্ছে মহাশূন্যতা বা মহাকাশ ধাতুর উপরে ক্ষিতি, আপ, তেজ, মরুৎ সমন্বিত এই মহা পৃথিবীই একটি ভাসমান তরী। অনাদি অনন্তকাল গর্ভে তরীটি পৃথিবী ধাতু প্রকোপে, আপধাতু প্রকোপে, বায়ু ধাতু প্রকোপে, তেজঃ ধাতু প্রকোপে-টলমল, গমিষ্ণু, চলিষ্ণু, অস্থির, অনিত্য। যা অনিত্য, অস্থির-তা-ই দুঃখময়, যা দুঃখময়, তা-ই অনাত্মা। যা সিদ্ধাচার্যের মহাশূন্যতা, তা-ই কবিগুরুর মহাকাল। মহাশূন্যতাও সর্বতোশূন্য আর মহাকালও সর্বতোশূন্য। এই দু'য়ে পার্থক্য কোথায় ?

সোনার তরী কবিতায়- আমিত্ব মমত্বকে স্বীকার করেননি। ব্যক্তিকে স্বীকার না করে ব্যক্তির সৃষ্টিকে স্বীকার করে নিয়েছেন। সুতরাং আমি মনে করি- পরোক্ষভাবে শাশ্বত আত্মাকে অস্বীকার এবং সর্বশূন্য অনাত্মাকে স্বীকার করা হয়েছে। বৌদ্ধ নীতি আদর্শে-আমিত্ব মমত্ব-বোধই-আত্মা আর তৎসম্পর্কিত সর্বশূন্যতা বোধই-অনাত্মা।

বৈশাখ (গীতি)

প্রাচীন ভারতে বর্ষগণনার রীতি ছিল বর্তমান যুগ থেকে স্বতন্ত্র। বাংলা জাতীয় বর্ষগণনাটি বৃহত্তর ভারতেরই গণনা। এটা প্রাচীন ভারতের শুধু জাতীয়বর্ষ নহে, ধর্মীয়বর্ষও বটে। তখন বারমাসের নাম ছিল-অগ্রহায়ণ মাস থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত, এই বারমাস। অগ্র অর্থ প্রথম, হায়ন অর্থ মাস, কার্তিক মাস বছরের শেষ মাস। এজন্য প্রাচীন লোকের মুখে কত কত প্রবচন আছে। প্রবচনগুলো আমার সম্পূর্ণ জানা না থাকলেও বছরের প্রথম

মাসের অর্থে ও শেষ মাসের প্রবচনে-বর্ষ গণনার রীতি যে অগ্রহায়ণ থেকে কার্তিক পর্যন্ত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন হল কেন, কোন্ সময় থেকে বর্ষ গণনার রীতিটা পরিবর্তিত হয়ে বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত পর্যবসিত হল?

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন - প্রাচীন ভারতের বর্ষগণনার রীতিটা-তথাগত বুদ্ধের জীবনাদর্শের গুরুত্ববোধেই পরিবর্তন করা হয়েছে। যেহেতু বুদ্ধের আবির্ভাব, বুদ্ধত্বলাভ ও তিরোভাব জীবনের এই তিনটি বিশিষ্ট ঘটনা একই মাসে সংঘটিত হয়েছিল বলেই বর্ষগণনার রীতিটা পরিবর্তন করে বৈশাখকে বৎসরের অগ্রে স্থান দেওয়া হয়েছে। তদবধি উক্ত বারমাস প্রাচীন ভারত বর্ষের জাতীয় ও ধর্মীয় বর্ষরূপে পরিগণিত ও প্রতিপালিত। ভারতীয় লোকেরা অদ্যাবধি এটাকে পবিত্র মাসরূপে পুরাতন বছরের শেষ দিন ও নতুন বছরের প্রথমদিন সমারোহের সাথে নানা প্রকার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন। বৌদ্ধ ত্রিপিটক শাস্ত্রানুসারে বার মাসের নাম হচ্ছে- বেসাখ, জেট্‌ঠ, আসাল্‌হ, সাবন, পোট্‌ঠপাদ, অস্‌সয়ুজ, কাত্তিক, মাগসির, ফুসস, মাঘ, ফাগ্‌গুন ও চিত্ত। (এই বার মাস ভারত- বাংলা উপমহাদেশে ধর্মীয় বর্ষরূপে পরিগণিত। অন্যান্য বৌদ্ধ প্রধান রাষ্ট্রে ধর্মীয় বর্ষরূপে পরিগণিত হয় বটে কিন্তু জাতীয় বর্ষ হিসাবে নয়। জাতীয় বর্ষ তাদের নিজ নিজ দেশে বর্ষগণনা স্বতন্ত্র। তদনুযায়ী তারা অনুসরণ করে থাকেন। যেমন বার্মাদেশে তাদের জাতীয় বর্ষের বারমাস হলো এই- তেঁখু, কাছুৎ, নায়ুং, ওয়াছো, ওয়াখং, তোছালেং, নয়াক্যওয়ে, ঢেঁছুবু, ন্যাইটো, প্রাছো, তবোথেই, তাবং।

আমাদের ভারত বাংলা উপমহাদেশে বৌদ্ধ সমাজে চৈত্র সংক্রান্তি ও নববর্ষের প্রথম দিনে নানা প্রকারে মহা সমারোহের সাথে আমোদ প্রমোদপূর্ণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে জাগের আগুন জ্বালান ও পোহান প্রাচীন সংস্কৃতির বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ একটি পবিত্র কর্তব্য। সময় হচ্ছে- সংক্রান্তি দিবসের পূর্বরাত্রি আট প্রকার কাঁটা-কন্টক সংগ্রহ করে স্তূপাকার করে রাখা হয়। এই কন্টকস্তূপে থাকে বিষ কাটালি, বেতকাঁটা, মণ-কাঁটা, ঘাগরা কাঁটা এবং সেই সেই দিনকার যতসব পাতা-পত্র, মলাট কাগজ, আবিল আবর্জনা। স্তূপে অগ্নিসংযোগ করে পোহাতে থাকে এবং আবৃত্তি করতে থাকে গ্রাম্য নানা প্রকার ছড়া দোঁহাবলীঃ

যাগ্ রে যাগ্, মাছি মশা খড় কূটা
সাত দরিয়া পার হয়ে যাক্।
জাগ্‌রে জাক্, বাইন্যা বাড়ির টেঁয়ার ছালা
আঁরো বাড়িত জাগ্।
জাগ্‌রে জাগ্, হক্কল বাড়ীর বৌ-ঝি
আঁরো বাড়িত যাক্।
যাক্ রে যাক, জীবনের আবর্জনা দূর হয়ে যাক্।
যাক্‌রে যাক্, রোগ শোক জরাব্যাধি দূর হয়ে যাক্।
ভালা আয়ক বুড়া যাক্, এ বাড়ির হদগা যাক্,

এ বাড়ির আপদ বলা ছাপ হয়ে যাক।

কবিগুরুর গীতবিতানে আছে-বৈশাখ নামে একটি দশ পংক্তির গান, তা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ
তাপস নিশ্বাস বায়ে, মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।
যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে যাওয়া গীতি,
অশ্রু বাষ্প সুদূরে মিলাক।
মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা,
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।
রসের আবেশ রাশি, শুষ্ক করি দাও আসি,
আনো আনো আনো তব প্রলয়ের শাঁখ।
মায়ার কুজ্ঝটি জাল যাক দূরে যাক।।

বর্ষশেষ ও নববর্ষ সম্পর্কে কবিগুরু পুরান বছরকে বিদায়াভিনন্দন এবং নতুন বছরকে বরণাভিনন্দন জানিয়েছেন এক চমৎকার ভাষণে তার কিছুটা অংশ এখানে উদ্ধৃত না করে পারলাম না। তিনি লিখেছেন-

"আমাদের ঋতুরাজের যে কাপড়খানা আছে, তার একপিঠে নতুন, এক পিঠে পুরাতন। যখন উল্টে পরেন তখন দেখি শুকনো পাতা, ঝরাফুল। আবার যখন পাল্টে নেন, তখন সকালবেলা মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী, তখন ফাল্গুনের আম্র মঞ্জরী, চৈত্রের কণকচাঁপা। উনি একই মানুষ নতুন পুরাতনের মধ্যে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছেন"। তিনি বুদ্ধ প্রশস্তি কবিতায় বলেছেন-

যা কিছু মলিন যা কিছু কালো
যা কিছু বিরূপ হোক তা ভালো

ঘুচাও ঘুচাও সব আবরণ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩০৫ সালে বছরের সর্বশেষ দিনের শেষ মুহূর্তে দেখতে পেলেন এক প্রচন্ড ঝড় উঠেছে। তাতে তিনি লক্ষ্য করলেন এই ঝড়, খড়-কূটা,শুকনো পাতা ঝড়াপত্র যত আবিল আবর্জনা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই দৃশ্যে কবির অন্তরে ভাবতরংগের সৃষ্টি হল। পুরাতন ক্লান্ত বর্ষের পরিসমাপ্তির সংগে সংগে যে ভীষণ কাল-বৈশাখী ঝড় উঠে প্রাকৃতিক জীর্ণতা অপসারিত করল। তৎসংগে আত্মজীবনের অতৃপ্তি ভাবও নিশ্চিহ্ন হতে পারে। সারা বর্ষব্যাপী যে উদ্দাম আবেগ এবং প্রচণ্ড শক্তির সম্ভার সৃষ্টি হয়েছিল তা জীবনের অবসাদে ও নিষ্ক্রিয় জড়ভাবে পরিণতি লাভ করেছে। দেহে ও মনমানসিকতায় ক্লৈব্য ভাবের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হয়েছে। তথাপি বাইরের সাথে সাথে অন্তরের পরিবর্তন এটাই সকলের মোক্ষম ভাব। চৈত্রের ঝড়ে পুরাতন বৎসরের আবর্জনা, ঝড়ে পড়া জীর্ণতা, শীর্ণতা, নিস্ফল

কামনা বাসনা, কুসংস্কার, ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা, জড়তা অন্তর থেকে উড়ে যাক। এটাই কবির যেমন কামনা, তেমনি সর্বসাধারণের বাসনা। চক্ষুস্থির মুখ বিমর্ষ, তথাপি সুখ সুপ্রসন্ন। সেহেতু সম্মুখে নতুন জীবনের নূতন আবেগের উজ্জ্বল আলোক সে পুরান নির্মোকের বদ নতুন নির্মোকের সৃষ্টি।

লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, ক্রোধ, অহংকার, ঈর্ষা, মাৎসর্য-ইত্যাদিকে সাধারণ বাংলা ভাষায় বলে মনোবিকার। এই মনোবিকারের শিকার হয়ে আমরা মানুষ হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা, ছলনা, বঞ্চনা, আত্মা শ্লাঘা, পরনিন্দা, কটূক্তি, ভেদবাক্য, দল-কুলের রেষারেষি, নিকায়গত আস্ফালন, ঝগড়া-বিবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি দোষ দুষ্ট কর্ম সম্পাদন করে জীবনের প্রগতির পথ রুদ্ধ করি। সর্বক্ষণ অকুশল সংস্কার স্তূপাকার করে সুখ শান্তি থেকে বঞ্চিত হই। স্বর্গ মোক্ষের অন্তরায় সৃষ্টি করে জীবন দুঃখ ভারাক্রান্ত করি। এতে প্রত্যক্ষভাবে নিজের ও পরোক্ষভাবে অপরের দুঃখ অশান্তির কারণ হই। মনোবিকার ব্যতীত মানসিক বাচনিক কিংবা শারীরিক কোন দুষ্কর্ম সম্পাদিত হতে পারে না। দূষিত মনোতরংগ আশে পাশের বাতাবরণকে প্রভাবিত ও দূষিত করে। পক্ষান্তরে বিকারবিমুক্ত চিত্ত বিকারশূন্য হলেই সর্বপূর্ণ হয়ে যায় না। মানুষ যখন দূষিত মনোবিকার মুক্ত ও নির্মল থাকে তখন অনুশীলন ও কঠোর সাধনার প্রভাবে চিত্তগর্ভে বিপরীত আবেগটা পরম সম্পদে পূর্ণতা লাভ করে। তখন স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের অন্তর প্রদেশ স্নেহ মমত্ব, মৈত্রী, করুণা ও প্রজ্ঞা ইত্যাদি সম্ভারে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। নির্মল বিশুদ্ধ চিত্তের তরংগগুলো আশে পাশের বাতায়নকে প্রভাবিত করে বিশুদ্ধ করে তোলে। তবু প্রকৃত সুখ শান্তির যদি লাঘব ঘটে, তবে বুঝতে হবে যে, নিজের মন কোনরূপ আত্ম-প্রবঞ্চনাতে মশগুল।

চৈত্র সংক্রান্তি ও নববর্ষের প্রথম ভোর রাত্রে বিষ-কাটালি ইত্যাদি কন্টকরাশি, আবর্জনাস্তূপ ভস্মীভূত করার রীতি। জাগের আগুন পোহানোর রেওয়াজ, পুরান বছরের নীচতা, হীনতা, জীর্ণতা কুসংস্কার বন্ধন হতে পরিত্রাণ লাভ করে, নতুন বছরের জীবনের গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আহ্বান করার লক্ষ্যে নানা প্রকার গেঁয়ো ভাষায় ছড়া আবৃত্তি-এইসব প্রাচীন সংস্কৃতির চর্চাকে আবহমান কাল ধরে ভারত বাংলা উপমহাদেশে এবং বৌদ্ধ অধ্যুষিত বহির্দেশে অনুশীলিত হয়ে আসছে তা নিতান্ত বাহ্যিকরূপ। এই আবৃত্তির ভাষায় রয়েছে প্রত্যেক অঞ্চলে প্রত্যেকের নিজ নিজ আঞ্চলিক গেঁয়ো ভাষা। এগুলোর নেপথ্যে রয়েছে বিশ্ব জীবনের মরমে নিরত প্রকৃত আধ্যাত্মিক রূপ।

মানুষের জীবনে লোভ, দ্বেষ, মোহাদি জীবনের প্রগতি পথের যত অন্তরায়, বাধা বিপত্তি আছে তা হচ্ছে বাহ্যিক রূপে বিষ কাটালি ইত্যাদি কাঁটা কন্টক ও আবর্জনারাশি। আত্ম বিশুদ্ধি লাভ করতে হলে বাহ্য কাঁটা কন্টকাদি পুড়ে ছাই করে ফেললে কোন লাভ হবে না। আধ্যাত্মিক রূপে লোভ দ্বেষ মোহাদি মানসিক বিকার, বিরোধ ও বিরূপ অহংপ্রতীতি, সর্বমালিন্য ধ্বংস করে জীবনের সাম্য, মৈত্রী করুণা ও প্রজ্ঞাদেবীকে অধিষ্ঠিত করতে হবে।

প্রাচীন সংস্কৃতির জীবন্ত রূপ জীবনে প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

এটাই সংস্কৃতির মূল আদর্শ। এই গেঁয়ো মূর্খ লোকের গেঁয়ো ভাষার মর্মার্থক সংস্কৃতি মূলক ভাষণগুলো আর কবিগুরুর গীতি কবিতা বৈশাখঃ উচ্চাংগের সাহিত্যিক বিশুদ্ধ ভাষায় ছন্দাকারে লিপিবদ্ধ ভাষণগুলো- এই উভয়ের মধ্যে ভাষা ও ছন্দের পার্থক্য থাকলেও মর্মার্থক অনুভূতিতে কোন পার্থক্য নেই। মূলতঃ উভয়ই এক ও অভিন্ন। সংস্কৃত ভাষার একটি শ্লোকে উল্লেখ আছে-

মূর্খ বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।

দ্বয়রেব সমং পুণ্যং ভাব গ্রাহী জনাদ্ধনঃ।।

মূর্খ লোক অতীব আন্তরিক শ্রদ্ধাভরে ভগবানের আরাধনা করার সময় বলে-বিষ্ণা, বিষ্ণা, বিষ্ণা। আর পন্ডিত ব্যক্তি বিশুদ্ধ ভাষায় ভগবানের আরাধনা করেন- বিষ্ণবে, বিষ্ণবে, বিষ্ণবে। উভয়ের পুণ্যময় শক্তি সংস্কার সমতুল্য। শুদ্ধাশুদ্ধ দ্বিবিধ ভাষায় কিছু আসে যায় না। উপাস্য দেবতা ভাবই গ্রহণ করেন, ভাষা নয়।

বাংলাদেশ ষড়-ঋতুর দেশ। তন্মধ্যে বসন্ত ঋতু হচ্ছে ঋতুর মধ্যে রাজা। বৈশাখ মাস হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। তদ্ধেতু কবিগুরু বৈশাখ মাসের এতখানি প্রাধান্য দিয়েছেন বলে সকলের ধারণা। আমি কিন্তু তা সর্বৈব সত্য বলে স্বীকার করতে পারি না। যেহেতু বৈশাখ মাসের মাহাত্ম্য ভারত বাংলা উপমহাদেশেই সীমিত নয়, এর মাহাত্ম্য সমগ্র বৌদ্ধ জগতে সম্প্রসারিত। তথাগত বুদ্ধের জীবন মহিম্মার তিনটি বিশিষ্ট ঘটনা-আবির্ভাব, বুদ্ধত্বলাভ ও তিরোভাব একই মাসের একই তিথিতে সংঘটিত হয়েছে বলেই কবিগুরুর বিশাল দৃষ্টি বৈশাখ মাসের উপর পতিত হয়েছে। এটা ভারত বাংলা উপমহাদেশে জাতীয় বর্ষ ও ধর্মীয় বর্ষের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাই কবিগুরুর বুদ্ধপ্রাণতা এই মাসের প্রতিআকর্ষণে সুপরিস্পুট।

তাজমহল

বৌদ্ধ ধর্মের মূলসূত্র হল, অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা। ইহাদের মধ্যে তথাগত বুদ্ধের সমগ্র দর্শন প্রতিভাত। বৌদ্ধধর্ম এই ত্রিলক্ষণ সমন্বিত। সকল দ্রব্যই অনিত্য, সতত পরিবর্তনশীল, গতিশীল তা-ই অনিত্য লক্ষণসম্পন্ন। যা পরিবর্তনশীল, গতিশীল-তা মোহমলিন, আমিত্ব মমত্ব মিশ্রিত-সুতরাং দুঃখবহ-ইহা দুঃখ লক্ষণসম্পন্ন। কেহ কেহ বলেন বৌদ্ধধর্ম দুঃখবাদী। বস্তুত বৌদ্ধধর্ম দুঃখবাদী নহে, দুঃখান্তবাদী। যা অনিত্যতা ও দুঃখময়তার অস্তিত্বে ভরপুর, তা শাশ্বত বস্তুহীন, সারহীন। জগতের সকল পদার্থের প্রতি যখন অহংকার মমকার শূন্যতা প্রাপ্তি ঘটবে, তখন সাধনাপ্রসূত প্রজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ হবে অনিত্য দুঃখের প্রতি ঔদাসীন্য ভাব। ইহাই অনাত্ম লক্ষণসম্পন্ন অশাশ্বত স্বরূপ। রামের পুত্র

বিয়োগে রামই শোক-তাপ করে, কান্নাকাটি করে। অন্য কেউ করে না। যেহেতু রামের পুত্রের মধ্যে রাম আছে। রামই আমিত্ব মমত্ব ও মোহাকারে নিহিত আছে; রামের পুত্রের মধ্যে অন্য কেউ নেই। কাজেই অন্য কারো চোখে জল নাই।

তথাগত বুদ্ধ বলেছেনঃ

অচ্চোন্তি কালা তরযন্তি রত্তিয়ো,
বয়ো গুণা অনুপুব্বং জহন্তি।
এতং ভযং মরণে পেক্‌খমানো,
লোকামিসং পজহে সন্তি পেক্‌খো।

কাল প্রবাহ শতাব্দী, যুগ, বৎসর, মাস, সপ্তাহ ও দিবা-রাত্রির আকারে অবিরাম প্রবাহিত হয়ে চলছে। এই চলার আদি নেই, অন্ত নেই। এই জন্য কাল আদ্যন্ত বিরহিত। কালের সাথে সাথে জগতের জড় অজড় বস্তু বিতাড়িত হচ্ছে। জীবনের বল, বীর্য, আয়ু, সম্পদ সবকিছু ক্ষয়ে ব্যয়ে অনিত্য দুঃখময় পরিণতির দিকে চলছে। সুতরাং এই ভয়াবহতা উপলব্ধি করে প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য লোকামিষ ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক শাশ্বত সত্যের সন্ধান করা।

তার বার শত বৎসর পরে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের আবির্ভাব। তন্মধ্যে চট্টলবাসী সিদ্ধাচার্য চাটিলপাদ তাঁর চর্যার বলেছেনঃ

ভব নই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী,
দু আন্তে চিখিল মাঝেঁ ন বাহী।

এই ভবনদী অতিশয় গম্ভীর, প্রবল বেগে প্রবাহিত। দুই তীর কর্দমাক্ত, গমনাগমনের অযোগ্য, মাঝে থই নেই। ভবনদীর এক তীর হচ্ছে চক্ষু কর্ণাদি ষড়েন্দ্রিয়। অপর তীর হচ্ছে ষড়েন্দ্রিয়ের অবলম্বন রূপ রস গন্ধাদি ষড় বিধ বিষয়বস্তু। দুই তীরের সংযোগ সংঘর্ষ চলছে অবিরাম অবিশ্রাম প্রতিক্ষনিক। মাঝে ফাঁক নেই, থই নেই। ইহার অপর নাম জীবন বা কর্মপ্রবাহ।

ফরাসী বৈজ্ঞানিক বের্গস বলেছেন, জীবনের সত্য স্বরূপ হচ্ছে-অনন্তপ্রবাহ, দুঃখবহ অনিত্য।

ভারতের সম্রাট শাহ্‌জাহানের প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ মহলের সমাধিসৌধের নাম তাজমহল, দিল্লীর সমীপবর্তী প্রসিদ্ধ নগর আগ্রা, যমুনা নদীর তীরে আগ্রা নগরে প্রতিষ্ঠিত এই তাজমহল। ইহা ২২০ ফুট উচ্চ। ইহার নির্মান কার্য ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয় এবং ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। বিশ হাজার কারিগর ২১ বৎসর ধরে নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত থেকে ইহা শেষ করে। সমগ্র বিশ্বের তৎকালীন সপ্ত আশ্চর্যের মধ্যে অন্যতম মহান আশ্চর্য। এই স্মৃতিসৌধ গঠন প্রণালীতে কারুশিল্পে চারুশিল্পে, গাম্ভীর্যে ও আকৃতি বৈশিষ্ট্যে পৃথিবীতে অতুলনীয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শাহ্‌জাহান নামে কবিতা লিখলেন। এই কবিতা ১৩২১ সালে সবুজপত্রের অগ্রহায়ন সংখ্যায় তাজমহল নামে প্রকাশিত হয়। ইহা ভাষায় গম্ভীর, ভাব ব্যঞ্জনা ও মনোহারিণী কল্পণায় অতি মহত্বপূর্ণ। ইহার কবিত্বময় ঐশ্বর্য অতুল্য।

কবিগুরু কবিতার সর্ব প্রথম চত্ত্বরে বলেছেনঃ

এ কথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শাহ্‌জাহান,
কাল স্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনবান।

এই বিশ্ব কালের স্রোতে ভাসমান অবিরাম গতিশীল। এই ভাসমান গতিশীলতার মধ্যে বিশ্বের স্বরূপ প্রাণ-শক্তি নিহিত। এই গতি যেখানে রুদ্ধ হয়ে যায়, সেখানে যত আবিলতা আবর্জ্জনা জমে উঠে। এমনকি মৃত্যু এসে হাজির হয়। এই গতির মধ্যে জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান মিলে এবং মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া যায়। সম্রাট শাহ্‌জাহানের শোকাতুরা বিরহ বেদনার অনুভূতি অনুধাবন করে কবি যদিও বলেছেনঃ

হীরা মুক্তা মানিকের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের
ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা।
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক
শুধু থাক
এক বিন্দু নয়নের জল
কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

এই বিশ্বের সকল দ্রব্য সম্ভার লুপ্ত হয়ে যাক। ধ্বংসে যাক জীবনের ধনমান। আমার চাওয়া পাওয়ার আর কিছু নেই। আমি চাই প্রেমপ্রীতি ভরা এক ফোটা নয়নের জল স্বরূপ প্রেমের প্রতীক চির কালের জন্য শাশ্বত হয়ে চির সমুজ্জ্বল থাকুক এই অশ্রু বৃষ্টি ভরা তাজমহল।

কবিগুরু সম্রাটের অনুভূতি অনুধাবন করে আরো বলেছেনঃ

তুচ্ছ করি রাজ্য-ভাঙাগড়া,
তুচ্ছ করি জীবন মৃত্যুর উঠাপড়া,
যুগে যুগান্তরে
কহিতেছে এক স্বরে
চির বিরহীর বাণী নিয়া
ভূলি নাই, ভূলি নাই, ভূলি নাই প্রিয়া।

রাজ্যের উত্থান পতন তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং জীবনের অস্তিত্ব বা জন্ম মৃত্যুকে উপেক্ষা করে মানুষের অন্তর যে যুগ যুগান্তর ধরে চির বিরহীর দুঃখ বেদনা নিয়ে বলতেই থাকে-আমি প্রিয়াকে কি কখনো ভূলতে পারি? ইহা কখনো নীরবে, নিঃশব্দে আর কখনো বা সরবে প্রকাশ্যে মহাকালের সচেতন প্রহরীকে এড়িয়ে সর্ব জন সর্বক্ষণ অতিশয় সংগোপনে অন্তরে অন্তরে বলতে থাকে "ভূলি নাই, ভূলি নাই, ভূলি নাই-প্রিয়া"। ইহা তো শুধু শাহ্‌জাহানের কথা নহে। ইহা সমগ্র বিশ্বের প্রতিচ্ছবি। ইহা কি সত্য? সত্য নয়। বিরহ বেদনার স্মৃতি মানুষের জীবনে ক্ষণিক, সাময়িক, অস্থায়ী। বিস্মৃতিই চিরস্থায়ী। বিচ্ছেদকে ভুলে যায়।

কামনা বাসনার তাড়নায়, সাংসারিক নানাবিধ উত্তাল তরংগের প্রচন্ড তোড়ে ভূলতে বাধ্য হয়। বিস্মৃতি অন্তরগহনে পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে। সুতরাং ভূলি নাই, ভূলি নাই এ কথা নিতান্ত মিথ্যা। বিরহের স্মৃতি যদি এত সতত ও মর্মান্তিক অপরিত্যাজ্য হত, তবে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার একের পর এক দারপরিগ্রহ চলত না। সমগ্র কবিন্দ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের ভাষ্যকার চারু বন্দোপাধ্যায় তাজমহল সম্পর্কিত ভাষ্যে বলেনঃ

'কীর্তিমান মানুষ বা জীবন কিছুতেই আবদ্ধ হয়ে থাকে না। সে কিছুতে বন্দী হয় না বলেই তার কীর্তি বিলাপ করে বলে,

স্মৃতি ভারে আমি পড়ে আছি,
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।

তাজমহলের অনুতাপ হচ্ছে-আমি যার স্মৃতি বহন করে চলছি, যার স্মৃতি ভারে পড়ে আছি, সে আজ ইহলোকে নেই। সে লোকান্তরে গত। অনিত্যতার জন্য বড় দুঃখ।

যে চলে যায় সেই হচ্ছে 'সে', তার স্মৃতিবন্ধন নাই। তার যে অহং কাঁদছি সেই তো ভার-বওয়া পদার্থ। আমি, আমার বলে যেটা কান্নাকাটি করে সেই সাধারণ পদার্থটা হচ্ছে 'আমি'। আমার বিরহ, আমার স্মৃতি, আমার তাজমহল। যে মানুষটা বলে তারই প্রতীক ঐ গোরস্থান। আর যে মুক্ত হয়েছে, সে লোক লোকান্তরের যাত্রী, তাকে কোন এক স্থানে ধরে রাখা যায় না। না তাজমহলে, না ভারত সাম্রাজ্যে, না অন্তরীক্ষে, না সমুদ্র গর্ভে, না পর্বত বিবরে, না শাহ্জাহান নামরূপধারী বিশেষ ইতিহাসের ক্ষণকালীন অস্তিত্বে।

বর্তমান অনিত্য, নিত্য গতিশীল, তাই সে মুহূর্তকে বলি 'তুমি আছ', অমনি সেইটা 'নাই' হয়ে যায়। এজন্য ফরাসী বৈজ্ঞানিক বের্গ্স বলেছেন,-----বর্তমান বলে কিছু নেই। যে মুহূর্তে যাকে বর্তমান বলি, সেই মুহূর্তেই তা অতীত হয়ে যায়। অতএব কালের মধ্যে আছে কেবল অতীত ও ভবিষ্যত। আর মধ্যে হাইফেন হয়ে আছে পরিস্থিতিহীন বিন্দুমাত্র বর্তমান। যা এখন আছে তখন নাই-তা রিক্ত, শূন্য, অনন্ত আকাশে গ্রহ নক্ষত্র সর্বত্র বায়ু প্রবাহ নৃত্য করছে, চঞ্চল অস্থির অনিত্য। পাতালে আপধাতু নিত্য চলমান, গতিশীল। জড় অজড় বিশ্বে তেজধাতুর প্রকোপ তারতম্য লাভে সর্বক্ষণ গত্যন্তর, নিত্য পরিবর্তনশীল। জীবের জীবনে চিত্তপ্রবাহ ক্ষণে ক্ষণে ভাবান্তরশীল। চিত্ত প্রবাহের গতি এত তড়িৎ গতিতে চলে যে, জগতে এমন কোন পদার্থ নেই যা চিত্তের গতি প্রবাহের সাথে তুলনা চলে। এই অনিত্যতাকে, নিত্য গতিশীলতাকে অনাত্মা বা নিঃসারকে উপলক্ষ্য করে কবি বলেছেনঃ

'অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা'।

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রমাণ করেছে যে, বস্তু হচ্ছে তাপ চাপ পরমাণু প্রভৃতির বিচিত্র রূপান্তরমাত্র। অণু পরমাণু গতিরই সমষ্টি মাত্র। ইলেক্ট্রন প্রোটন ধারণাতীত গতিশীল। তাই একই বস্তু তাপ ও পরমাণু সংস্থানের তারতম্যে বিভিন্ন আকার ধারণ করে থাকে। একই বস্তু হাইড্রোজেন-অক্সিজেনের সমবায়ে উৎপন্ন যে জল, সেই জলই কখনো তরল হয়ে নদীতে প্রবাহিত হচ্ছে, কখনো বাষ্পীভূত হয়ে মেঘ হয়ে আকাশে উড়ছে, কখনো প্রতপ্ত তাপ

হয়ে ইঞ্জিনে গতি সঞ্চার করছে। আবার কখনো বা জমাট কঠিন তুষার পর্বতে পরিণত হচ্ছে। এভাবে সমগ্র বিশ্বে পরিবর্তনশীলতা ও গতিশীলতা চলছে অহরহঃ। এতে কোন বাধা বিপত্তি কিছু নেই। কবি গুরু 'যেতে নাহি দেব' কবিতায় বলেছেনঃ

চঞ্চল স্রোতের নীরে পড়ে আছে
একখানি অচঞ্চল ছায়া
অশ্রু বৃষ্টি ভরা কোন্ মেঘের মায়া'?

বিশ্বের জীবনপ্রবাহ চঞ্চল নদীর জলধারার ন্যায় অবিরাম অবিশ্রামভাবে প্রবাহিত হয়ে চলছে। তাতে বাধা বিপত্তি নেই। প্রত্যক্ষ কোন কারণ নেই। এই বিশ্ব চলমান জগতে চলমান পথিক। কিন্তু একখানি অটল অচল ছায়া জীবন স্রোত ধারার নীচে পড়ে আছে। এই ছায়া হচ্ছে মায়া, মোহ, আসক্তি, তৃষ্ণা। তজ্জনিত অশ্রুধারা হচ্ছে-শোকাতুরা, বেদনা বিদুর, বিচ্ছেদ-বিরহ, বিয়োগের অশ্রু। ইহা কি কোন মেঘের মায়া? না, নৈসর্গিক মেঘের নির্ঝরিণী বারিধারা নহে। ইহা মায়া মমত্বের বাস্তব নিদর্শন পরিদেবন ধারা। ইহা জগতের দুশ্ছেদ্য বিষাত্মিকা তৃষ্ণা প্রেমাসক্তি। ইহা চিত্তপ্রবাহের অন্তরজগতে তুষাগ্নিতুল্য ধিকি ধিকি অহরহঃ জ্বলছে।

চঞ্চলা কালনদী অথবা ভবনদীমাঝে ভারতেশ্বর শাহ্জাহান নৈসর্গিক ও আধ্যাত্মিক শাশ্বত সত্যকে উপেক্ষা করে পত্নীপ্রেম, নারীপ্রেমে মোহিত হয়ে বিরহ বেদনার স্মৃতিকে চিরন্তন সত্যে পরিণত করার লক্ষ্যে অসংখ্য অজস্র অর্থব্যয়ে বিশ্বে সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আর্শ্চয তাজমহল প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। সম্রাটের অনিমেষ প্রেমপ্রীতি ভালবাসার অক্ষয় কীর্তির নিদর্শন সম্রাজ্ঞীর সমাধিসৌধ। তাঁর কামনা বাসনাজনিত যে কল্পনা গর্ভাধান লাভ করেছিল, তদনুযায়ী তাঁর অভিপ্রায় ছিল কোন কালে কোন অবস্থায় ইহা ক্ষুন্ন হবে না। বিশ্বব্যাপী ইহার গৌরব চির অম্লান থাকবে। তা কি সম্ভব? কেউ যদি বিশ্বের শাশ্বত সংবিধান অনিত্যতা, গতিশীলতা, দুঃখময়তার উল্টো দিকে বিপরীত নীতিআদর্শে চলতে থাকে তাঁর ইচ্ছা কি কোনদিন সিদ্ধ হবে? যা কোন কালে কোন যুগে সম্ভব হয়নি, হবে না। ইহা সম্রাটের চিত্তপ্রবৃত্তির অচঞ্চল ছায়া, মায়া, আমিত্ব মমত্ববোধের কায়া। ছায়া, কায়া, মায়া-এই তিনের সমন্বয় ঘটেছিল সম্রাট শাহ্জাহানের অন্তর প্রদেশে। তাই তিনি বিশ্ববিধানের বিপরীত ধর্মী সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আজ কোথায় গেলেন সম্রাটের জগৎসার চমৎকার প্রাণ-প্রতিমা মমতাজ মহল? আজ কোথায় সম্রাট শাহ্জাহান স্বয়ং। কোথায় গেলেন তার আত্মীয় পরিজন? জাগতিক অনিত্যতার অপ্রতিহত বিধানে চিরকালের জন্য অনন্ত গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছেন। লাখ লাখ বৎসর পরও কোনদিন পরস্পর আর সাক্ষাৎ ঘটবে না। আমরাও কেউ এ জগতে অমর হয়ে থাকব না। যেহেতু জগৎ ও প্রাণীজগৎ সকলেই সব কিছুই মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত। তাজমহলের ক্ষণকালে আর প্রাণীজীবনের ক্ষণকালে ব্যবধান থাকলেও বস্তুতঃ পরিবর্তনশীলতা ও গতিশীলতা এক ও অভিন্ন। জীব জীবনের গতিশীলতা অপেক্ষাকৃত অতীব তড়িৎ। তাজমহলের এখন আয়ুষ্কাল প্রায় তিনশত বছর। ধরা বক্ষে তাজমহলের সঞ্জীবনী শক্তি আরো বহুকাল যাবৎ প্রত্যাশা রাখে। ক্ষণের ব্যবধান যতই থাকুক না কেন,

তিলে তিলে ক্ষণে ক্ষণে ক্ষয়শীলতা ব্যয়শীলতায় পরিবর্তিত হতে হতে এমন একদিন আসবে যেদিন এই প্রেমাসক্তির প্রতীক মনোহারিণী জগৎনন্দিনী তাজমহল প্রস্ফুটিত পদ্ম প্রতোদদণ্ডের ন্যায় যেরূপ অবস্থানে দণ্ডায়মান, সেই অবস্থান একদিন অনিত্যতা, দুঃখময়তা ও অনাত্মা বা নিঃসারতার প্রভাবে জীর্ণ শীর্ণ বালি কণিকায় পর্যবসিত হয়ে যেতে বাধ্য। এখনই তাজমহল সর্বক্ষণ প্রাকৃতিক ধর্মকে অনুসরণ করে চলছে।

তাই কবিগুরু অনিত্য দুঃখকে পরিস্ফুট করে কবিতায় বলেছেনঃ

চলে গেছ তুমি আজ
মহারাজ,
রাজ্য তব স্বপ্ন সম গেছে ছুটে
সিংহাসন গেছে টুটে।
তব সৈন্য দল
যাদের চরণ ভরে ধরণী করিত টলমল
তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ু ভরে
উড়ে যায় দিল্লীর পথের ধুলি' পরে।
বন্দীরা গাহে না গান,
যমুনা কল্লোল সাথে নহবত মিলায় না তান।

কবিগুরু এক গীতি কবিতায় বলেছেনঃ

নয়ন তোমাকে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমাকে পায় না জানিতে হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।
বাসনার বশে মন অভিরত
ধায় দশ দিশে পাগলের মত।
স্থির-আঁখি তুমি মরমে সতত জাগিছ শয়নে স্বপনে।

আজ তাজমহল লোকচক্ষুর সম্মুখে দৃশ্যমান অটুট বস্তুরূপে জাজ্বল্যমান। সকলের মন বাহ্য শোভা সৌন্দর্যে উল্লসিত। ইহার গুরুত্ব মহত্ত্বের অস্তিত্ব হৃদয়ে প্রচ্ছন্নাকারে থাকা সত্ত্বেও প্রকৃষ্ট রূপ উপলব্ধিতে আসে না। যেহেতু মন বাসনার বশে অস্থির, অগভীর, অদূরদর্শী, বিচার বুদ্ধিশূন্য। কামনা বাসনার অতি তাড়নায় রূপে শব্দে গন্ধে রসে স্পর্শে চিন্তা চেতনায় পাগলের মত দিক্‌দিগন্তে অভিরত ভ্রাম্যমান। যখন কোন মহত্তম উচ্চাংগের সাধনায় সম্যক দৃষ্টি শান্ত সমাহিত হয়ে গর্ভাধান লাভ করবে, তখন জগতের শাশ্বত স্বরূপ, অনিত্য-দুঃখ-অনত্মার প্রকৃত চরিত্র শয়নে স্বপনে ঘুমন্তে জাগরণে সর্বক্ষণ লোকচক্ষুর গোচরীভূত হবে। ইহার উত্থান-পতন লোক চক্ষুর সমক্ষে দৃশ্যমান হয়ে উঠবে। তখন তাজমহলের কার্যকারণ নীতির উৎস, শাশ্বত স্বরূপ এবং চরম পরিণতি কারো জ্ঞান-চক্ষুর অন্তরালে থাকবে না। তখন প্রত্যক্ষরূপে জগৎ সমক্ষে আদ্য-পান্ত অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মা হয় দৃশ্যমান জ্ঞান চক্ষুর প্রভাবে; চর্ম চক্ষুর প্রভাবে নয়। চর্মচক্ষু দ্বারা যে দর্শন তা মিথ্যাদর্শন, সত্য দর্শন নহে। সত্য শাশ্বত চরিত্র দর্শন প্রজ্ঞা চক্ষুর দ্বারাই সম্ভব।

সম্রাট শাহ্জাহানের পত্নী প্রেমাসক্তি যে শুধু তাঁর পত্নী মমতাজ মহলের প্রতি সীমিত ছিল, তাও নয়। তাঁর প্রেমাসক্তি অতীত অনাগত বর্তমান কালের সকল আসক্তির স্রোত ধারার মধ্যে যেন উদগ্র সংস্কাররূপে প্রবাহিত হতে ছিল। শাহ্জাহান সম্পর্কিত অন্য কবির অন্য কবিতায়ও তার প্রমাণ আমরা পেয়ে থাকি।

বাংলার বিখ্যাত সাহিত্যিক শাহাদৎ হোসেনের রচিত শাহ্জাহানের 'মৃত্যু স্বপ্ন' নামক কবিতায় পাওয়া যায়, -মৃত্যু পথযাত্রী মোগল সম্রাট শাহ্জাহানের জীবনের শেষ পর্বে আগ্রার কারা প্রকোষ্ঠে বন্দী অবস্থায় সম্রাট শাহ্জাহানের পরম নির্ভর ও একমাত্র সান্ত্বনার উৎস তাঁর বিদূষী কন্যা সেবাশুশ্রূষায়। নিযুক্তা জাহানারা শয্যার পার্শ্বে উপবিষ্টা। এমন সময় জাহানারার সাথে কথোপকথনস্থলে বলেছিলেন,

নহে তোর জননীর শুধু-
জগতের প্রেমিক প্রেমিকা চলে গেছে
আসিবে যাহারা সবার প্রেমের স্মৃতিরূপ
লভিয়াছে আমার মর্মের মাঝে
তারি এ প্রকাশ মূর্ত; শোন্ জাহানারা,
অশ্রুর মর্মর কাব্য অমর কাহিনী।

অনতিদূরে যমুনা তীরে জ্যোৎস্না প্লাবিত তাজমহল দেখা যাচ্ছে। শাহ্জাহানের জীবন প্রদীপ নির্বাসিত প্রায়। পার্থিব জগতের সব আকর্ষণ ভূলে মধ্যম পান্ডবের ভাস পক্ষীর একমাত্র আঁখি যুগল দর্শনের ন্যায় সম্রাট কেবল তাঁর প্রিয়তমা পত্নী মমতাজের স্মৃতিই বক্ষে ধারণ করে আছেন। অন্য সব দিক তাঁর শূন্য।

আগ্রার দূর্গ প্রাসাদ, জ্যোৎস্না রাত্রি, অন্তিম শয্যায় শায়িত সম্রাট শাহ্জাহান। পার্শ্বে সেবানিরতা কন্যা জাহানারা। পিতা- কন্যার মধ্যে কথোপকথনের শব্দ ছাড়া অন্য শব্দ নেই। তিনি মুক্ত গবাক্ষপথে অনিমেষ নেত্রে তাজের দিকে চেয়ে রলেন। তখন সম্রাট সহসা উন্মাদের ন্যায় শয্যার উপর উঠে বসে তাজমহলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলতে লাগলেন,-

ওই ওই ওই আসে জাহানারা! ওই
আসে জননী রে তোর মনিমালা হারা
ফেরদৌসের রূপলক্ষ্মী ওই আসে নেমে।
দেখ্ দেখ্ জাহানারা সেই-সেই-সেই।

বলতে বলতে অতিরিক্ত উত্তেজনা বশে মুর্চ্ছিত হয়ে শয্যার উপরে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর সে মুর্চ্ছা আর ভাঙ্গল না।

মায়া মোহের কী মর্মন্তুদ পরিহাস। মৃত্যুকালে মমতাজ মহল মৃত্যু নিমিত্ত রূপে সম্রাটের অন্তর গহণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন। মোহ-মলিন অন্ধতার দুর্ভোগজনিত জীবনান্তকর কী দুঃসহ দুঃখ। মোঘল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর শাহ্জাহান নিঃস্ব নিঃসহায় আজ অন্ধকার কারা-রুদ্ধতায় প্রাণত্যাগ করলেন। জাগতিক শাশ্বত সংবিধান-অনিত্য, দুঃখ অনাত্মার গর্ভে চিরতরে বিলীন হয়ে গেলেন।

বুদ্ধ জন্মোৎসব

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভ জটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী।
বিকশিত কর, প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলংকশূন্য।

এসো দানবীর, দাও ত্যাগ কঠিন দীক্ষা-
মহাভিক্ষু, লও সবার অহংকার ভিক্ষা।
লোক লোক ভুলুক শোক, খন্ডন কর মোহ,
উজ্জ্বল হোক জ্ঞানসূর্য উদয় সমারোহ-
প্রাণ লভুক সকল ভুবন, নয়ন লভুক অন্ধ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলংকশূন্য।

ক্রন্দনময় নিখিল হৃদয় তাপদহনদীপ্ত,
বিষয়বিষবিকারজীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত।
দেশ দেশ পরিল তিলক, রক্তকলুষ গ্লানি,
তব মংগল শঙ্খ আন তব দক্ষিণ পাণি-
তব শুভ সংগীতরাগ, তব সুন্দর ছন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন ধরণীতল কর' কলংকশূন্য।

২১ ফাল্গুন ১৩৩৩

সকল কলুষতামসহর জয় হোক্ তব জয়।
অমৃতবারি সিঞ্চন কর নিখিল ভুবনময়।
জয় হোক্ তব জয়।
মহাশান্তি, মহাক্ষেম,
মহাপুণ্য, মহাপ্রেম।
জ্ঞান সূর্য-উদয় ভাতি
ধ্বংস করুক তিমির রাতি,
দুঃসহ দুঃস্বপ্ন ঘাতি
অপগত কর ভয়।
মোহ মলিন অতি দুর্দিন-

শংকিতচিত পান্থ
জটিল গহন পথ সংকট-
সংশয় উদ্‌ভ্রান্ত।
করুণাময় মাগি শরণ-
দুর্গতি ভয় করহ হরণ,
দাও দুঃখ বন্ধ তরণ
মুক্তির পরিচয়।
মহাশান্তি, মহাক্ষেম,
মহাপুণ্য, মহাপ্রেম।

বৈশাখী পূর্ণিমা ১৩৩৮।

বুদ্ধদেবের প্রতি

(সারানাথে মূলগন্ধকুটি বিহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রচিত)

ওই নামে একদিন ধন্য হল দেশে দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।
সেই নাম আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে
দান করো তুমি।
বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হোক, মুক্ত হোক মোহ-আবরণ-
বিস্মৃতির রাত্রি শেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ
নবপ্রাতে উঠুক কুসুমি।
চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু,
আয়ু করো দান।
তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হোক প্রাণবান্
খুলে যাক রুদ্ধ দ্বার, চৌদিকে ঘোষুক শঙ্খধ্বনি
ভারত-অংগনতলে আজি তব নব আগমনী,
অমেয় প্রেমের বার্তা শত কণ্ঠে উঠুক নিঃস্বনি-
এনে দিক অজেয় আহবান।

দার্জিলিং ২৪ অক্টোবর, ১৯৩১ (১৩৩৮)।

বোরোবুদুর

সেদিন প্রভাতে সূর্য এইমত উঠেছে অম্বরে
অরণ্যের বন্দনমর্মরে।
নীলিম বাষ্পের স্পর্শ লভি
শৈলশ্রেণী দেখা দেয় যেন ধরণীর স্বপ্নছবি।
নারিকেল বন প্রান্তে নরপতি বসিল একাকী
ধ্যানমগ্ন-আঁখি।
উচ্চে উচ্ছ্বসিল প্রাণ অন্তহীন আকাঙ্ক্ষাতে,
কী সাহসে চাহিল পাঠাতে
আপন পূজার মন্ত্র যুগ-যুগান্তরে
অপরূপ অমৃত অক্ষরে
নিখিল বিচিত্র লেখা, সাধকের ভক্তির পিপাসা
রচিল আপন মহাভাষা
সর্বকাল সর্বজন
আনন্দে পড়িতে পারে যে ভাষার লিপির লিখন।
সে লিপি ধরিল দ্বীপ আপন বক্ষের মাঝখানে,
সে লিপি তুলিল গিরি আকাশের পানে।
সে লিপির বাণী সনাতন
করেছে গ্রহণ
প্রথম-উদিত সূর্য শতাব্দীর প্রত্যহ প্রভাতে।
অদূরে নদীর কিনারাতে
অলি-বাঁধা মাঠে
কত যুগ ধরে চাষী ধান বোনে আর ধান কাটে-
আঁধারে আলোয়
প্রত্যহের প্রাণলীলা সাদায় কালোয়
ছায়ানাট্যে ক্ষণিকের নৃত্যচ্ছবি যায় লিখে লিখে,
লুপ্ত হয় নিমিখে নিমিখে।
কালের সে লুকোচুরি, তারি মাঝে সংকল্প সেকার
প্রতিদিন করে মন্ত্রোচ্চার,
বলে অবিশ্রাম-
'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।
প্রাণ যার দুদিনের, নাম যার মিলালো নিঃশেষে
সংখ্যাতীত বিস্মৃতের দেশে,
পাষাণের ছন্দে ছন্দে বাঁধিয়া গেছে সে

আপনার অক্ষয় প্রণাম-
'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।
কত যাত্রী কত কাল ধ'রে
নম্রশিরে দাঁড়ায়েছে হেথা করজোড়ে।
পূজার গম্ভীর ভাষা খুঁজিতে এসেছে কতদিন
তাদের আপন কণ্ঠ ক্ষীণ।
ইংগিতপুঞ্জিত তঙ্গ পাষাণের সংগীতের তানে
আকাশের পানে
উঠেছে তাদের নাম,
জেগেছে অনন্ত ধ্বনি 'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।
অর্থ আজ হারায়েছে সে যুগের লিখা,
নেমেছে বিস্মৃতি কুহেলিকা।
অর্ঘ্যশূন্য কৌতূহলে দেখে যায় দলে দলে আসি
ভ্রমণ বিলাসী-
বোধশূন্য দৃষ্টি তার নিরর্থক দৃশ্য চলে গ্রাসি।
চিত্ত আজি শান্তিহীন লোভের বিকারে,
হৃদয় নীরস অহংকারে।
ক্ষিপ্রগতি বাসনার তাড়নায় তৃপ্তিহীন ত্বরা,
কম্পমান ধরা।
বেগ শুধু বেড়ে চলে উর্ধশ্বাসে মৃগয়া উদ্দেশে-
লক্ষ্য ছোটে পথে পথে, কোথাও পৌছেনা পরিশেষে।
অন্তহারা সঞ্চয়ের আহুতি মাগিয়া
সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধানল উঠেছে জাগিয়া।
তাই আসিয়াছে দিন,
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন,
আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থ দ্বারে
শুনিবারে

পাষাণের মৌণতটে যে বাণী রয়েছে চিরস্থির-
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র 'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।

বোরোবুদুর, যবদ্বীপ, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৭।

সিয়াম (থাইল্যান্ড)
প্রথম দর্শনে

বজ্রমন্দ্ররবে
আকাশে ধ্বনিতেছিল পশ্চিমে পূরবে,
মরুপারে, শৈলতটে, সমুদ্রের কূলে উপকূলে,
দেশে দেশে চিত্তদ্বার দিল যবে খুলে
আনন্দমুখর উদবোধন-
উদ্দাম ভাবের ভার ধরিতে নারিল যবে মন,
বেগ তার ব্যাপ্ত হল চারিভিতে,
দুঃসাধ্য কীর্তিতে কর্মে, চিত্রপটে মন্দিরে মূর্তিতে,
আত্মদান সাধন স্ফূর্তিতে,
উচ্ছ্বসিত উদার উক্তিতে,
স্বার্থঘন দীনতার বন্ধন মুক্তিতে-
সে মন্ত্র অমৃতবাণী, হে সিয়াম, তব কানে
কবে এল কেহ নাহি জানে
অভাবিত অলক্ষিত আপনা বিস্মৃত শুভক্ষণে
দূরাগত পান্থ সমীরণে।
সে মন্ত্র তোমার প্রাণে লভি প্রাণ
বহুশাখা প্রসারিত কল্যাণে করেছে ছায়াদান।
সে মন্ত্র-ভারতী
দিল অস্খলিত গতি
কত শত শতাব্দীর সংসারযাত্রারে-
শুভ আকর্ষণে বাঁধি তারে
এক ধ্রুবকেন্দ্র সাথে
চরম মুক্তির সাধনাতে-
সর্বজনগণে তব এক করি একাগ্র ভক্তিতে-
এক ধর্ম, এক সংঘ, এক মহাগুরুর শক্তিতে।
সে বাণীর সৃষ্টিক্রিয়া নাহি জানে উদ্দেশ।
সে বাণীর ধ্যান
দীপ্যমান করি দিবে নব নব জ্ঞান
দীপ্তির ছটায় আপনার,
এক সূত্রে গাঁথি দিবে তোমার মানসররত্নহার।
হৃদয়ে হৃদয়ে মিল করি
বহু যুগ ধরি
রচিয়া তুলেছ তুমি সুমহৎ জীবনমন্দির,

পদ্মাসন আছে স্থির,
ভগবান বুদ্ধ সেথা সমাসীন
চিরদিন-
মৌন যাঁর শান্তি অন্তহারা,
বাণী যাঁর সকরুণ সান্তনার ধারা।
আমি সেথা হতে এনু যেথা ভগ্নস্তূপে
বুদ্ধের বচন রুদ্ধ দীর্ণকীর্ণ মূক শিলারূপে,
ছিল যেথা সমাচ্ছন্ন করি
বহু যুগ ধরি
বিস্মৃত কুয়াশা
ভক্তির বিজয়স্তম্ভে - সমুৎকীর্ণ অর্চনার ভাষা
সে অর্চনা সেই বাণী
আপন সজীব মূর্তি খানি
রাখিয়াছে ধ্রুব করি শ্যামল সরস বক্ষে তব,
আজি আমি তারে দেখি লব।
ভারতের যে মহিমা
ত্যাগ করি আসিয়াছে আপন-অংগন-সীমা
অর্ঘ্য দিব তারে
ভারত-বাহিরে তব দ্বারে।
সিন্ধ করি যাব স্নান
তোমার জীবন ধারা স্রোতে,
যে নদী এসেছে বহি ভারতের পুণ্যযুগ হতে-
যে যুগের গিরিশৃংগ'- পর
একদা উদিয়াছিল প্রেমের মংগল দিনকর।

ব্যাংকক। ১১ অক্টোবর, ১৯২৭।

হে মহাজীবন, হে মহামরণ, লইনু শরণ লইনু শরণ।।
আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা,
পরাও পরাও জ্যোতির টিকা-করে হে তোমার লজ্জা হরণ।।
পরশ রতন তোমারি চরণ-লইনু শরণ লইনু শরণ।
যা কিছু মলিন যা কিছু কালো
যা কিছু বিরূপ হোক তা ভালো-ঘুচাও ঘুচাও সব আবরণ।
লইনু শরণ লইনু শরণ।।

১৩৪২ সালের ৪টা জ্যৈষ্ঠ বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে মহাবোধি সোসাইটি হলে কবিগুরুর ভাষণঃ

বুদ্ধদেব

আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি। একোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের উপকরণগত অলংকার নয়, একান্তে নিভৃতে যা তাঁকে বার বার সমর্পণ করেছি সেই অর্ঘ্যই আজ এখানে উৎসর্গ করি। একদিন বুদ্ধগয়াতে গিয়েছিলাম মন্দির দর্শনে, সেদিন এই কথা আমার মনে জেগেছিল- যাঁর চরণস্পর্শে বসুন্ধরা একদিন পবিত্র হয়েছিল তিনি যেদিন সশরীরে এই গয়াতে ভ্রমণ করছিলেন, সেদিন কেন আমি জন্মাইনি, সমস্ত শরীর মন দিয়ে প্রত্যক্ষ তাঁর পুণ্য প্রভাব অনুভব করিনি।

তখনি আবার এই কথা মনে হল যে, বর্তমান কালের পরিধি অতি সংকীর্ণ, সদ্য উৎক্ষিপ্ত ঘটনার ধুলি-আবর্তে আবিল, এই অল্প পরিসর অস্বচ্ছ কালের মধ্যে মহামানবকে আমরা পরিপূর্ণ করে উপলব্ধি করতে পারিনে ইতিহাসে বার বার তার প্রমাণ হয়েছে। বুদ্ধদেবের জীবিতকালে ক্ষুদ্র মনের কত ঈর্ষা, কত বিরোধ তাঁকে আঘাত করেছে, তাঁর মাহাত্ম্য খর্ব করবার জন্যে কত মিথ্যা নিন্দার প্রচার হয়েছিল। কত শত লোক ইন্দ্রিয়গতভাবে তাঁকে কাছে দেখেছে। তারা অন্তরগতভাবে নিজেদের থেকে তাঁর বিপুল দূরত্ব অনুভব করতে পারেনি, সাধারণ লোকালয়ের মাঝখানে থেকে তাঁর অলৌকিকত্ব তাদের মনে প্রতিভাত হবার অবকাশ পায়নি। তাই মনে করি, সেদিনকার প্রত্যক্ষ ধাবমান ঘটনাবলীর অস্পষ্টতার মধ্যে তাঁকে যে দেখিনি সে ভালোই হয়েছে। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা জন্মমুহূর্তেই স্থান গ্রহণ করেন মহাযুগে, চলমান কালের অতীত কালেই তাঁরা বর্তমান, দূরবিস্তীর্ণ ভাবীকালে তাঁরা বিরাজিত। একথা সেদিন বুঝেছিলুম সেই মন্দিরেই। দেখলুম, দূর জাপান থেকে সমুদ্র পার হয়ে একজন দরিদ্র মৎস্যজীবি এসেছে কোনো দুষ্কৃতির অনুশোচনা করতে। সায়াহ্ন উত্তীর্ণ হল নির্জন নিঃশব্দ মধ্যরাত্রিতে, সে একাগ্রমনে করজোড়ে আবৃত্তি করতে লাগলঃ আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম। কত শত শতাব্দী হয়ে গেছে, একদা শাক্যরাজপুত্র গভীর রাত্রে মানুষের দুঃখ দূর করবার সাধনায় রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে বেরিয়েছিলেন, আর সেদিনকার সেই মধ্যরাত্রে জাপান থেকে এল তীর্থযাত্রী গভীর দুঃখে তাঁরই শরণ কামনা করে। সেদিন তিনি ঐ পাপ পরিতপ্তের কাছে পৃথিবীর সকল প্রত্যক্ষ বস্তুর চেয়ে প্রত্যক্ষতম, অন্তরতম,

তাঁর জন্মদিন ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে ঐ মুক্তিকামীর জীবনের মধ্যে। সেদিন সে আপন মনুষ্যত্বের গভীরতম আকাঙ্ক্ষার নরোত্তম। যে বর্তমান কালে ভগবান বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল সেদিন যদি তিনি প্রতাপশালী রাজরূপে, বিজয়ী বীররূপেই প্রকাশ পেতেন, তাহলে তিনি সেই বর্তমান কালকে অভিভূত করে সহজে সম্মান লাভ করতে পারতেন; কিন্তু সেই প্রচুর সম্মান আপন ক্ষুদ্র কালসীমার মধ্যেই বিলুপ্ত হত। প্রজা বড়ো করে জানত রাজাকে, নির্ধন জানত ধনীকে, দুর্বল জানত প্রবলকে-কিন্তু মনুষ্যত্বের পূর্ণতাকে সাধনা করছে যে মানুষ সেই স্বীকার করে, সেই অভ্যর্থনা করে মহামানবকে। মানব-কর্তৃক মহামানবের স্বীকৃতি

মহাযুগের ভূমিকায়। তাই আজ ভগবান বুদ্ধকে দেখছি যথাস্থানে মানবমনের মহা সিংহাসনে মহাযোগের বেদীতে, যার মধ্যে অতীত কালের মহৎ প্রকাশ বর্তমানকে অতিক্রম করে চলেছে। আপনার চিত্তবিকারে আপন চরিত্রের অপূর্ণতায় পীড়িত মানুষ আজও তাঁরই কাছে বলতে আসছেঃ বুদ্ধের শরণ কামনা করি। এই সুদূর কালে প্রসারিত মানবচিত্তের ঘনিষ্ট উপলব্ধিতেই তাঁর যথার্থ আবির্ভাব।

আমরা সাধারণ লোক পরম্পরের যোগে আপনার পরিচয় দিয়ে থাকি; সে পরিচয় বিশেষ শ্রেণীর, বিশেষ জাতির, বিশেষ সমাজের। পৃথিবীতে এমন লোক অতি অল্পই জন্মেছেন যাঁরা আপনাতে স্বতই প্রকাশবান, যাঁদের আলোক প্রতিফলিত আলোক নয়, যাঁরা সম্পূর্ণ প্রকাশিত আপন মহিমায়, আপনার সত্যে। মানুষের খন্ড প্রকাশ দেখে থাকি অনেক বড়ো লোকের মধ্যে; তাঁরা জ্ঞানী, তাঁরা বিদ্বান, তাঁরা বীর, তাঁরা রাষ্ট্রনেতা; তাঁরা মানুষকে চালনা করেছেন আপন ইচ্ছামত; তাঁরা ইতিহাসকে সংগঠন করেছেন আপন সংকল্পের আদর্শে। কেবল পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রকাশ তাঁরই, সকল দেশের সকল কালের সকল মানুষকে যিনি আপনার মধ্যে অধিকার করেছেন, যাঁর চেতনা খন্ডিত হয়নি রাষ্ট্রগত জাতিগত দেশকালের কোন অভ্যস্ত সীমানায়।

মানুষের প্রকাশ সত্যে। এই সত্য যে কী তা উপনিষদে বলা হয়েছেঃ আত্মবৎ সর্ব্বভুতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি। যিনি সকল জীবকে আপনার মতো করে জানেন তিনিই সত্যকে জানেন। আপনার মধ্যে সত্যকে যিনি এমনি করে জেনেছেন তাঁর মধ্যে মনুষ্যত্ব প্রকাশিত হয়েছে, তিনি আপন মানবমহিমায় দেদীপ্যমান।

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
চাত্মানং সর্বভূতেষু ন ততো বিজুগুপ্সতে।

সকলের মধ্যে আপনাকে ও আপনার মধ্যে সকলকে যিনি দেখতে পেয়েছেন, তিনি আর গোপন থাকতে পারেন না, সকল কালে তাঁর প্রকাশ।

মানুষের এই প্রকাশ জগতে আজ অধিকাংশ লোকের মধ্যে আবৃত। কিছু কিছু দেখা যায়, অনেকখানি দেখা যায় না। পৃথিবী সৃষ্টির আদিযুগে ভূমণ্ডল ঘন বাষ্প আবরণে আচ্ছন্ন ছিল। তখন এখানে সেখানে উচ্চতম পর্বতের চূড়া অবারিত আলোকের মধ্যে উঠতে পেরেছে। আজকের দিনে তেমনি অধিকাংশ মানুষ প্রচ্ছন্ন, আপন স্বার্থে, আপন অহংকারে, অবরুদ্ধ চৈতন্যে। যে সত্যে আত্মার সর্বত্র প্রবেশ সেই সত্যের বিকাশ তাদের মধ্যে অপরিণত। মানুষের সৃষ্টি আজও অসম্পূর্ণ হয়ে আছে। এই অসমাপ্তির নিবিড় আবরণের মধ্যে থেকে মানুষের পরিচয় আমরা পেতুম কি করে যদি না মানব সহসা আমাদের কাছে আবির্ভূত হত কোনো প্রকাশ্মান মহাপুরুষের মধ্যে ? মানুষের সেই মহাভাগ্য ঘটেছে, মানুষের সত্যস্বরূপ দেদীপ্যমান হয়েছে ভগবান বুদ্ধের মধ্যে, তিনি সকল মানুষকে আপন বিরাট হৃদয়ে গ্রহণ করে দেখা দিয়েছেন। ন ততো বিজুগুপ্সতে-আর তাঁকে গোপন করবে কিসে, দেশকালের কোন সীমাবদ্ধ পরিচয়ের অন্তরালে, কোন সদ্য প্রয়োজন সিদ্ধির প্রলুব্ধতায় ?

ভগবান বুদ্ধ তপস্যার আসন থেকে উঠে আপনাকে প্রকাশিত করলেন। তাঁর সেই প্রকাশের আলোকে সদ্যদীপ্তিতে প্রকাশ হল ভারতবর্ষের। মানব-ইতিহাসে তাঁর চিরন্তন আবির্ভাব ভারতবর্ষের ভৌগলিক সীমা অতিক্রম করে ব্যাপ্ত হল দেশ দেশান্তরে। ভারতবর্ষ তীর্থ হয়ে উঠল, অর্থাৎ স্বীকৃত হল সকল দেশের দ্বারা, কেননা বুদ্ধের বাণীতে ভারতবর্ষ সেদিন স্বীকার করেছে সকল মানুষকে। সে কাউকে অবজ্ঞা করেনি, এইজন্যে সে আর গোপন রইল না। সত্যের বন্যায় বর্ণের বেড়া দিলে ভাসিয়ে, ভারতের আমন্ত্রণ পৌঁছল দেশ-বিদেশের সকল জাতির কাছে। এল চীন ব্রহ্মদেশ জাপান, এল তিব্বত মংগোলিয়। দুস্তর গিরিসমুদ্র পথ ছেড়ে দিলে অমোঘ সত্যবার্তার কাছে। দূর হতে দূরে মানুষ বলে উঠল, মানুষের প্রকাশ হয়েছে, দেখেছি-মহান্তং পুরুষং তমসঃ পরস্তাৎ। এই ঘোষণাবাক্যে অক্ষয়রূপ নিল মরুপ্রান্তরে প্রস্তর মূর্তিতে। অদ্ভুত অধ্যবসায়ে মানুষ রচনা করলে বুদ্ধ বন্দনা, মূর্তিতে, চিত্তে, স্তূপে। মানুষ বলেছে, যিনি অলোকসামান্য দুঃসাধ্য সাধন করেই তাঁকে জানাতে হবে ভক্তি। অপূর্ব শক্তির প্রেরণা এল তাদের মনে; নিবিড় অন্ধকারে গুহাভিত্তিতে তারা আঁকল ছবি, দুর্বহ প্রস্তর খন্ডগুলোকে পাহাড়ের মাথায় তুলে তারা নির্মাণ করলে মন্দির, শিল্প-প্রতিভা পার হয়ে গেল সমুদ্র, অপরূপ শিল্প সম্পদ রচনা করলে, শিল্পী আপনার নাম করে দিলে বিলুপ্ত, কেবল শাশ্বত কালকে এই মন্ত্র দান করে গেলঃ বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। জাভাদ্বীপে বরোবুদুরে দেখে এলুম সুবৃহৎ স্তূপ পরিবেষ্টনে করে শত শত মূর্তি খুদে তুলেছে বুদ্ধের জাতক-কথার বর্ণনায়; তার প্রত্যেকটিতেই আছে কারুনৈপুণ্যের উৎকর্ষ, কোথাও লেশমাত্র আলস্য নেই, অনবধান নেই, এ'কে বলে শিল্পের তপস্যা; একইসংগে এই তপস্যা ভক্তির - খ্যাতি লোভহীন নিষ্কাম কৃচ্ছ্রসাধনায় আপন শ্রেষ্ঠ শক্তিকে উৎসর্গ করা চিরবরণীযের চিরস্মরণীয়ের নামে। কঠিন দুঃখ স্বীকার করে মানুষ আপন ভক্তিকে চরিতার্থ করেছে, তারা বলেছে, যে প্রতিভা নিত্যকালের সর্বমানবের ভাষায় কথা বলে সেই অকৃপণ প্রতিভার চূড়ান্ত প্রকাশ না করতে পারলে কোন উপায়ে যথার্থ করে বলা হবে' তিনি এসেছিলেন সকল মানুষের জন্যে সকলকালের জন্যে' ? তিনি মানুষের কাছে সেই প্রকাশ চেয়েছিলেন, যা দুঃসাধ্য, চিরজাগরুক, যা সংগ্রামজয়ী, যা বন্ধনচ্ছেদী। তাই সেদিন পূর্ব মহাদেশের দুর্গমে দুস্তরে বীর্যবান পূজার আকারে প্রতিষ্ঠিত হল তাঁর জয়ধ্বনি, শৈল শিখরে, মরুপ্রান্তরে, নির্জনগুহায়। এর চেয়ে মহত্তর অর্ঘ্য এল ভগবান বুদ্ধের পদমূলে যেদিন, রাজাধিরাজ অশোক শিলালিপিতে প্রকাশ করলেন তাঁর পাপ, অহিংসা ধর্মের মহিমা ঘোষণা করলেন, তাঁর-প্রমানকে চিরকালের প্রাংগনে রেখে গেলেন শিলাস্তম্ভে।

এত বড়ো রাজা কি জগতে আর কোনদিন দেখা দিয়েছে। সেই রাজাকে মাহাত্ম্যদান করেছেন যে গুরু তাঁকে আহবান করবার প্রয়োজন আজ যেমন একান্ত হয়েছে এমন সেদিনও হয়নি যে দিন তিনি জন্মেছিলেন এই ভারতে। বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে, অপবিত্র ভেদবুদ্ধির নিষ্ঠুর মূঢ়তা ধর্মের নামে আজ রক্তে পঙ্কিল করে তুলেছে এই ধরাতল, পরস্পর হিংসার চেয়ে সাংঘাতিক পরস্পর ঘৃণায় মানুষ এখানে পদে পদে অপমানিত। সর্বজীবে মৈত্রীকে যিনি মুক্তির পথ বলে ঘোষণা করেছিলেন সেই তাঁরই বাণীকে আজ উৎকণ্ঠিত হয়ে কামনা করি এই ভ্রাতৃবিদ্বেষ কলুষিত হতভাগ্য দেশে। পূজার বেদীতে আবির্ভূত হোন

মানবশ্রেষ্ঠ, মানবের শ্রেষ্ঠতাকে উদ্ধার করবার জন্যে। সকলের চেয়ে বড়ো দান যে শ্রদ্ধাদান, তার থেকে কোনো মানুষকে তিনি বঞ্চিত করেননি। যে দয়াকে, যে দানকে তিনি ধর্ম বলেছেন সে কেবল দূরের থেকে স্পর্শ বাঁচিয়ে অর্থদান নয়, সে দান আপনাকে দান-যে দান ধর্মে বলে 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্'। নিজের শ্রেষ্ঠতাভিমান, পুণ্যাভিমান, ধনাভিমান প্রবেশ করে দানকে অপমানকর অধর্মে পরিণত করতে পারে এই ভয়ের কারণ আছে ; এইজন্যে উপনিষদ বলেন ঃ ভিয়া দেয়ম। ভয় করে দেবে। যে ধর্মকর্মের দ্বারা মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হারাবার আশংকা আছে তাকেই ভয় করতে হবে। আজ ভারতবর্ষে ধর্মবিধির প্রণালীযোগে মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধার পথ চারিদিকে প্রসারিত হয়েছে। এরই ভয়ানকত্ব কেবল আধ্যাত্মিক দিকে নয়, রাষ্ট্রীয় মুক্তির দিকে সর্বপ্রধান অন্তরায় হয়েছে এ প্রত্যক্ষ দেখছি। এই সমস্যার কি কোনদিন সমাধান হতে পারে রাষ্ট্রনীতির পথে কোনো বাহ্য উপায়ের দ্বারা ?

ভগবান বুদ্ধ একদিন রাজসম্পদ ত্যাগ করে তপস্যা করতে বসেছিলেন। সে তপস্যা সকল মানুষের দুঃখ মোচনের সংকল্প নিয়ে। এই তপস্যার মধ্যে কি অধিকারভেদ ছিল ? কেউ ছিল কি ম্লেচ্ছ ? কেউ ছিল কি অনার্য ? তিনি তাঁর সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন দীনতম মুর্খতম মানুষের জন্যে। তাঁর সেই তপস্যার মধ্যে ছিল নির্বিচারে সকল দেশের সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা। তাঁর সেই এত বড়ো তপস্যা আজ কি ভারতবর্ষ হতে বিলীন হবে ? জিজ্ঞেস করি, মানুষে মানুষে বেড়া তুলে দিয়ে আমরা কী পেরেছি ঠেকাতে ? ছিল আমাদের পরিপূর্ণ ধনের ভান্ডার, তার দ্বার, তার প্রাচীর, বাইরের আঘাতে ভেংগে পড়েনি কি ? কিছু কি তার অবশিষ্ট আছে ? আজ প্রাচীরের পর প্রাচীর তুলেছি মানুষের প্রতি আত্মীয়তাকে অবরুদ্ধ করে, আজ দেবতার মন্দিরের দ্বারে পাহারা বসিয়েছি দেবতার অধিকারকেও কৃপণের মতো ঠেকিয়ে রেখে। দানের দ্বারা, ব্যয়ের দ্বারা, যে ধনের অপচয় হয় তাকে বাঁচাতে পারলুম না, কেবল দানের দ্বারা যার ক্ষয় হয় না, বৃদ্ধি হয়, মানুষের প্রতি সেই শ্রদ্ধাকে সাম্প্রদায়িক সিন্দুকের মধ্যে তালা বন্ধ করে রাখলুম। পুণ্যের ভান্ডার বিষয়ীর ভান্ডারের মতোই আকার ধরল। একদিন যে ভারতবর্ষ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর কাছে আপন মানুষ্যত্ব উজ্জ্বল করে তুলেছিল আজ সে আপন পরিচয়কে সংকুচিত করে এনেছে, মানুষকে অশ্রদ্ধা করেই সে মানুষের অশ্রদ্ধাভাজন হল। আজ মানুষ মানুষের বিরুদ্ধ হয়ে উঠেছে, কেননা মানুষ আজ সত্যভ্রষ্ট, তার মনুষ্যত্ব প্রচ্ছন্ন। তাই আজ মহামানবকে এই বলে ডাকবার দিন এসেছেঃ তুমি আপনার প্রকাশের দ্বারা মানুষকে প্রকাশ করো।

ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে। কিছুদিন পূর্বেই পৃথিবীতে এক মহাযুদ্ধ হয়ে গেল। এক পক্ষের জয় হল, সে জয় বাহুবলের, কিন্তু যেহেতু বাহুবল মানুষের চরম বল নয়, এইজন্যে মানুষ্যের ইতিহাসে সে জয় নিষ্ফল হল, সে জয় নূতন যুদ্ধের বীজ বপন করে চলেছে। মানুষের শক্তি অক্রোধে, ক্ষমাতে, এই কথা বুঝতে দেয় না সেই পশু যে আজও মানুষের মধ্যে মরেনি। তাই মানবের সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করে মানবের গুরু বলেছেন ঃ ক্রোধকে জয় করবে অক্রোধের দ্বারা, নিজের ক্রোধকে এবং অন্যের ক্রোধকে। এ না হলে মানুষ ব্যর্থ হবে, যেহেতু সে মানুষ। বাহুবলের সাহায্যে ক্রোধকে প্রতিহিংসাকে জয়ী করার দ্বারা শান্তি মেলেনা, ক্ষমাই আনে শান্তি, এ কথা মানুষ আপন রাষ্ট্রনীতিতে সমাজনীতিতে যতদিন স্বীকার করতে না পারবে ততদিন অপরাধীর অপরাধ

বেড়ে চলবে, রাষ্ট্রগত বিরোধের পৃথিবীর মর্মান্তিক সিদ্ধিলাভের দুরাশাকে যিনি নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন, যিনি বলেছিলেন 'অক্কোধেন জিনে কোধং', আজ সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করে মানুষ্যত্বের জগদ্ব্যাপী এই অপমানের যুগে বলবার দিন এল ঃ বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। তাঁরই শরণ নেব যিনি আপনার মধ্যে মানুষকে প্রকাশ করেছেন। যিনি সেই মুক্তির কথা বলেছেন, যে মুক্তি নঙর্থক নয়, সদর্থক, যে মুক্তি কর্মত্যাগে নয়, সাধুকর্মের মধ্যে আত্ম ত্যাগে, যে মুক্তি রাগদ্বেষ বর্জনে নয়, সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রী সাধনায়। আজ স্বার্থ-ক্ষুধান্ধ বৈশ্যাবৃত্তির নির্মম নিঃসীম রুদ্ধতার দিনে সেই বুদ্ধের শরণ কামনা করি যিনি আপনার মধ্যে বিশ্বমানবের সত্যরূপ প্রকাশ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

বুদ্ধের জীবনবাণীঃ সুভাষিত

এক

বুদ্ধদেব নাটক লেখক গিরীশ চন্দ্র ঘোষ। গিরীশ চন্দ্র ঘোষ বাংলার বিখ্যাত সাহিত্যিক। বুদ্ধ মহিমাকে আমাদের জাতীয় চরিত্রে তিনি যেভাবে প্রতিষ্ঠা দান করেছেন একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই। ইতোপূর্বে বা পরে তথাগত বুদ্ধের জীবনী নিয়ে বাংলাভাষায় এরূপ পূর্ণাংগ নাটক আর রচিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের ১৭ বৎসর পূর্বে গিরিশ চন্দ্রের জন্ম হয় কলকাতায়। তিনি প্রায় একশত নাটক, গীতিনাট্য, বিভিন্ন গ্রন্থ, অনুবাদ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি বাংলার 'গ্যারিক' নামে অভিহিত ছিলেন, যেহেতু তিনি লন্ডনের বিখ্যাত অভিনেতা গ্যারিকের ন্যায় খ্যাতনামা অভিনেতা ছিলেন। গিরীশ চন্দ্রের নাটকে তথাগত বুদ্ধের অপর করুণার বাণীও সীমাহীন, আত্মত্যাগের কাহিনী বাংগালীর অন্তর জয় করেছিল। তাঁর বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত আরেকটা নাটক 'অশোক' অশোকাবদানের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এতে ক্ষমা ও অহিংসার বাণীই কীর্তিত হয়েছে।

দুই

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম জীবনেই যেমন তথাগত বুদ্ধের মহত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তেমনি বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত বুদ্ধগয়া ও সারনাথ প্রভৃতি বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলো সম্পর্কেও তাঁর মনে এক গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মেছিল। তাই তিনি বৌদ্ধ পবিত্র তীর্থভূমিতে এবং বৌদ্ধধর্ম অধ্যুষিত বৌদ্ধ রাষ্ট্রসমূহ বিশেষ করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চীন, জাপান, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, মালয়, সিংগাপুর, সুমাত্রা, জাভা, বালি, শ্রীলংকা-এমন কোন রাষ্ট্র নেই- যেখানে কবিগুরু বারংবার গমন করেননি। কোন কোন দেশে তিনবার-চারবার পর্যন্ত গমন করেছেন। যেই উদ্দেশ্যে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে চীন দেশীয় পরিব্রাজক ফাহিয়ান, সপ্তম শতকে, অষ্টম শতকে হিউয়েন সাং, ইৎসিং, চেংগাচি প্রভৃতি ভিক্ষুগণ তথাগত বুদ্ধের জন্মস্থান, বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি স্থান, পরিনির্বাণ স্থান, ধর্ম বিস্তারস্থান পরিদর্শনে ভারত ভূমিতে এসেছিলেন; যেই উদ্দেশ্যে খৃষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে দশম শতকের মধ্যে আচার্য শান্তরক্ষিত, অসংগ, বসুমিত্র, অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান, বনরত্ন, তিব্বতী বাবা (দুর্গাচরণ ভিক্ষু) রাহুল সাংকৃত্যায়ন প্রভৃতি ভারতীয় ভিক্ষুরা নেপাল,

সিকিম, ভুটান, তিব্বত, মংগোলিয়া ইত্যাদি উদীচ্য এশিয়ায় পর্যটন করেছিলেন-ঠিক একই উদ্দেশ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ জগতের দেশ সমূহে এই পর্যটন করেছেন। তিনি যখন যেই দেশে গিয়েছেন সেখানকার প্রাচীন সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় তত্ত্ব তথ্য সব সংগ্রহ করেছেন এবং সেখানকার ধর্মীয় প্রতিকৃতি তুলে ধরেছেন ভারতে। বৌদ্ধধর্মের পতিত উর্মি এবং বিদেশে উথিত ঊর্মির বিচিত্র বিস্ময়কর রূপ দর্শন করে অভিভূত হয়েছেন। অন্তর রাজ্যে ভাব তরংগ চেপে ধরে রাখতে পারেন নি। তদ্ধেতু স্বাভাবিক কাব্যকবিত্বের উন্মেষ যত্র-তত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিবেকের বিরুদ্ধে অন্যায় অত্যাচারের সাথে কোন কিছুতেই ক্ষমা বা আপোস করেননি। জাপানে পর পর চারবার গমন করেছেন। জাপানের সবগুণ তিনি অন্তরের সহিত স্বীকার করলেন। জাপানকে অন্তরের সহিত ভালবাসলেও একটি বিষয়ে একমত হতে না পেরে তার প্রতিবাদে লেখনি ধারণ করলেন। তা হল-জাপানের আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ত সাম্রাজ্যবাদ। দানবের স্পর্ধিত ক্রূরতাকে ধিক্কার দিয়ে তিনি লিখলেন,-

যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে।
ওদের ঘাড় হল বাঁকা, চোখ হল রাঙা,
কিড়মিড় করতে লাগল দাঁত।
মানুষের কাঁচা মাংসে যমের ভোজভরতি করতে
বেরোল দলে দলে।
সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
তাঁর পবিত্র আশীর্বাদের আশায়।
বেজে উঠল তুরীভেরি গরগর শব্দে,
কেঁপে উঠল পৃথিবী।

জাপানের বুদ্ধভক্তির এই প্রহসন দেখে কবিগুরুর অন্তর কঠোর ভর্ৎসনায় উৎসারিত হল। তাঁর এই ভর্ৎসনা ও বুদ্ধপ্রাণতার বিরাট নেগেটিভ। বস্তুতঃ আধুনিক কালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগ স্থাপনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অপরিসীম ও বিরাট অবদান।

তিন

জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে তথাগত বুদ্ধ দুহাজার বৎসর পূর্বে মানবাত্মার মুক্তি ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন- মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হয়-জন্মে নয়, কর্মে, সদাচারে। অস্পৃশ্য, অন্ত্যজের গৃহে সানন্দে অন্নগ্রহণ করেন, চন্ডালকে আলিংগন করতে কোন দ্বিধা নেই, ক্ষৌরকার উপালি তথাগতের অন্যতম প্রধান শিষ্যের মর্যাদা লাভ করেছেন। ছুঁৎমার্গ, খাদ্যাখাদ্যে শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার, পৌরোহিত্যরূপ পুঞ্জীভূত গ্লানিতে বহুযুগ ধরে ভারতীয় জাতির প্রাণশক্তির বিরাট অপচয় হয়েছে। এটা মানবাত্মার কলংক। জাতির এই কলংক উপলক্ষ্যে স্বামী বিবেকানন্দ কত কত সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। স্বামীজী বলেছেন, - Untouchablity is a form of mental disease. সাবধান All expansion is life, all

contraction is death. আর কবিগুরু তাঁর সাহিত্যে, কাব্যে কবিত্বের সর্বত্র মৈত্রী করুণা সাম্যের বাণী প্রচার প্রতিষ্ঠা করেছেন।

চার

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, তাঁর জীবনে তিনি একবারই মূর্তির সম্মুখে প্রণাম নিবেদন করেছেন। বুদ্ধগয়াতে বুদ্ধমূর্তি দর্শন করেই এই ভাবোদয় হয়। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী হেমলতা ঠাকুরের এক বিস্ময়কর বিবরণ শ্রীমতি অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় লিপিবদ্ধ করেছেনঃ

"প্রতিদিন প্রাতরাশের পর গুরুদেব বুদ্ধমন্দিরে গমন করতেন একাকী এবং প্রায় দু'তিন ঘন্টা তিনি সেখানে অবস্থান করতেন। সংগের কিংবা বাহিরের কেউ সে সময়ে মন্দিরে যেতে পারবে না। এই নিষেধাজ্ঞা সকলের জানা থাকলেও বড়মা বলেন,- তাঁর মনে জাগে দারুণ কৌতূহল এবং এক প্রশ্ন। প্রশ্নটি হচ্ছে এই - কাকামশাই এত সময় মন্দিরে কি করেন? মূর্তিপূজার বিরোধী ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধ মন্দিরে কেন অতিবাহিত করেন অতটা সময়?

কৌতূহল নিরসনে অধীর হয়ে একদিন তিনি অন্যের অজ্ঞাতসারে নিষিদ্ধ সময়েই যান মন্দিরে এবং ভেজানো দরজা ঈষদুন্মুক্ত করে দেখতে পান উচ্চবেদীতে উপবিষ্ট বিরাট বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে দন্ডায়মান কবিগুরুর ধ্যান গম্ভীর নিশ্চল প্রতিমুর্তি। দুই চক্ষে দরবিগলিত অশ্রুধারা"।

পাঁচ

কবিগুরু রবীন্দ্র নাথের পরম অনুরাগী শান্তি নিকেতনের একজন প্রবীণ শিক্ষক (নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী) সকলে তাঁকে গোঁসাইজী বলে ডাকত। গোঁসাইজীর মুখে শোনা গেছে যে, একবার বুদ্ধগয়া থেকে ফিরে আসার পর রবীন্দ্রনাথ মস্তক মুন্ডন, গোঁফ দাড়ি ছেদন করেছিলেন। এখন কবির মনে এক বৈরাগ্য ভাবের সঞ্চার হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই নিত্যানন্দ গোস্বামীকে বৌদ্ধ ধর্মে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে সিংহল ও ব্রহ্মদেশে পাঠিয়েছিলেন।

ছয়

বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রতি দেশের ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, - ইতিহাস বা ভারতীয় সংস্কৃতির বহুতর উপকরণ যে বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে বহুদিন অনাদৃত এই বৌদ্ধশাস্ত্র ইউরোপীয় পন্ডিতগণ উদ্ধার করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন - আমরা তাঁদের পদানুসরণ করার প্রতীক্ষায় বসে আছি। ইহাই আমাদের দেশের পক্ষে দারুণতম লজ্জার কারণ। সমস্ত দেশে পাঁচজন লোকও কি বৌদ্ধ শাস্ত্র উদ্ধার করাকে চির জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করতে পারেন না? এই বৌদ্ধ শাস্ত্রের অভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কানা হয়ে আছে। এ কথা মনে করেও কি দেশের জন কয়েক তরুন যুবকের উৎসাহ এই পথে ধাবিত হবে না?

কবিগুরু এই মন্তব্য করেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি নিজেই এই মহান কর্মে ব্রতী

হয়েছিলেন। এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বিশ্বভারতী। বিশ্ব ভারতীতে বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চা। দেশ বিদেশের পন্ডিতগণের আগমনে বিশ্বভারতী বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চার প্রধান কেন্দ্র। ১৯০৬ সালে কাশী থেকে সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীকে বিশ্বভারতীতে এনে বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষার পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করেছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় দ্বারা ব্যাকরণ প্রকাশ। কবিগুরু কর্তৃক পালিপ্রকাশ। ধর্মপদ গ্রন্থখানি আগাগোড়া কন্ঠস্থ এবং অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' কাব্য বাংলায় অনুবাদ ইত্যাদি কর্মে বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার সূত্রপাত হয়। কালক্রমে তারই পরিণতিতে শান্তিনিকেতন চীনাভবনের সৃষ্টি। শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী, চীনা ভবন প্রভৃতি সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় - নালন্দা, তক্ষশীলা, জগদ্দল, বিক্রমশীলা, বালেন্দা, সোমপুরী, কণকস্তুপ, পন্ডিতবিহারের যুগান্তকার সংস্করণ। এটা দেখলে প্রাচীন যুগের বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম বা বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের দৃশ্যই দর্শকের নয়নগোচরে আসে।

সাত

এক্ষেত্রে একটি ছোট ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যা অধ্যাপক প্রবোধ চন্দ্র সেন মহাশয়ের মুখে শুনতে পাওয়া গিয়েছে। ঘটনা হল এই, -একবার করাচিতে অবস্থান কালে রবীন্দ্রনাথকে একজন ছাত্র জিজ্ঞেস করে ছিল, - 'আপনাকে তো সবাই গুরুদেব' বলে সম্বোধন করে। আপনার গুরু কে? ''হ্যাঁ, আমারও একজন গুরুদেব আছেন, তোমরা সবাই তাঁকে জান। তিনি হলেন বুদ্ধদেব। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য ও শিক্ষাদর্শ পর্যালোচনা করলে এই উক্তির সত্যতা নিরূপণ প্রমানিত হয়ে পড়বে।

আট

কবিগুরু সর্বপ্রাণীর প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দান করেছেন অপরিমেয় প্রেম বা মৈত্রী করুণার আদর্শকে। তাঁর বিভিন্ন নিজস্ব উক্তিই সপ্রমান হবে-

বুদ্ধদেবের আসল কথাটা কী সেটা দেখতে গেলে তাঁর শিক্ষার মধ্যে যে অংশটা নেগেটিভ সেদিকে দৃষ্টি দিলে চলবে না। যে অংশ পজিটিভ সেখানেই তাঁর আসল পরিচয়। যদি দুঃখ দূরই চরম কথা হয় তাহলে বাসনা লোপের দ্বারা অস্তিত্ব লোপ করে দিলেই সংক্ষেপে কাজ শেষ হয়-কিন্তু মৈত্রী ভাবনা কেন ? মৃত্যুদন্ডই যার উপর বিধান তার আবার ভালবাসা কেন, দয়া কেন? এর থেকে বোঝা যায় যে, এই ভালোবাসাটার দিকেই আসল লক্ষ্য - আমাদের অহং, আমাদের বাসনা স্বার্থের দিকে টানে - বিশুদ্ধ প্রেমের দিকে, আনন্দের দিকে নয় - এই জন্যই অহংকে নির্বাপিত করে দিলেই সহজেই সেই আনন্দলোক পাওয়া যাবে। সেই আনন্দই যে বুদ্ধদেবের লক্ষ্য তা বোঝা যায়।

নয়

ভারতবর্ষের যথার্থ সাধনাকে বিশ্বজগতের কাছে জয়ী করে তুলেছেন প্রাচীনকালের বুদ্ধ ও অশোক, আর আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ। তা ছাড়া আরতো কাউকে দেখিনে যিনি বিশ্ব জগতের কলকোলা হলের ঊর্ধে ভারতীয় সাধনার মৈত্রী ও প্রেমের বাণীকে সগৌরবে তুলে ধরতে পেরেছেন। দিগ্‌বিজয়ী গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের অস্ত্র-ঝনৎকার, সৈন্য সামন্তের বাহুবলের

যথাযোগ্য ভারতীয় প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন রাজর্ষি অশোক। দিগ্‌বিজয়ের পরিবর্তে ধর্ম-বিজয় দ্বারা রাজ্যাধিকারের বদলে ধর্মাধিকারের দ্বারা। তৎকালীন জগতের যে যে স্থলে আলেকজান্ডারের সেনাবাহিনী পশুবলের বিজয়বার্তা ঘোষণা করেছিল, প্রিয়দর্শী অশোকের শান্তিবাহিনী ধর্মীয় মিশনারী ঠিক সে-সব স্থলেই বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মচক্র চালিত করে নিনাদিত করে তুলেছিল বিশ্ব মৈত্রীর বিজয় ঘোষণা। আর আধুনিক কালে একাজ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি একাই বুদ্ধের বাণী ও অশোকের প্রচার - এই উভয় দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। বুদ্ধ, অশোক ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তফাৎ এই যে, বুদ্ধ বা অশোক স্বয়ং বিশ্বজগতে মৈত্রীর পতাকা বহন করে বহির্গত হননি। কিন্তু সম্রাট অশোক দিকে দিকে ধর্মের প্রচার প্রতিষ্ঠা কল্পে মিশনারীরূপে ভিক্ষুসংঘ পাঠিয়েছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দেশবিদেশে ভ্রমণ করে বুদ্ধের বাণী বহন করে প্রচার প্রতিষ্ঠা করেছেন। অশোক বুদ্ধবাণীকে বিশ্বজগতে চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে শিলালিপিরূপে উৎকীর্ণ, পর্বতগাত্রে অক্ষয় বিচিত্র পর্বতগুহায় সমগ্র ভারতবর্ষে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বিদ্যারূপে খোদিত, ৮৪ হাজার চৈত্য সংঘারাম প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। এইগুলিই হচ্ছে অশোক চরিত্রের সর্বাপেক্ষা অমূল্য দলিল। রবীন্দ্রনাথ তার কাব্যশক্তিতে সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতিতে বুদ্ধবাণীকে বিশ্বে চিরস্থায়ী করে গিয়েছেন। একদিক থেকে বাল্মীকি, কালিদাস ও যীশুখ্রীষ্টের চেয়ে অশোক বেশী ভাগ্যবান। কেননা তিনি নিজের পরিচয়কে অক্ষয় পাথরের গায়ে লিখে রেখে গেছেন। অশোকের উৎকীর্ণ এই শিলালিপিগুলো ঐতিহাসিকের পক্ষে অশোক চরিত্রের সর্বাপেক্ষা মুল্যবান দলিল। কিন্তু অশোক লিপির ভাষা বহুকাল ধরে মানুষের আয়ত্তের বাহিরে ছিল। সেজন্য অশোকের বাণী শত শত বছর ধরে মানবহৃদয়কে কেবল বোবার মত ইশারায় আহবান করেছে। অশোকলিপি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ

জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক আপনার যে কথাগুলোকে চিরকালের শ্রুতিগোচর করতে চেয়েছিলেন, তাদিগকে তিনি পাহাড়ের গায়ে খুদিয়ে দিয়েছিলেন। ভেবে ছিলেন - পাহাড় কোনকালে মরবেনা, সরবেনা, অনন্তকালের পথের ধারে অচল হয়ে দাঁড়িয়ে নব নব যুগের পথিকদের কাছে এককথা চিরদিন ধরে আবৃত্তি করতে থাকবে। পাহাড়কে তিনি কথা বলার ভার দিয়ে গেছেন।

দশ

জালিয়ানওয়ালা বাগ-পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরের একটি উদ্যানের নাম। রাউলাট আইনের প্রতিবাদ স্বরূপ এই অঞ্চলে উত্তেজনা দেখা দিলে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ কঠোর হস্তে তা দমন করেছিল। ডায়ার নামক সৈন্যাধ্যক্ষ ঐ স্থানে প্রাচীরবেষ্টিত মেলার দ্বার রুদ্ধ করে শত শত নিরীহ নর-নারীকে হত্যা করেছিল। তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রাণে বড় আঘাত লেগেছিল। কবিগুরুর এমন কোন শক্তি ছিল না যদ্বারা বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেন। অবশেষে নিরীহ গণ-হত্যার প্রতিবাদে কবি বৃটিশ সরকার প্রদত্ত যশমান 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করেছিলেন এতে সমগ্র বিশ্ব কেঁপে উঠেছিল। তাঁর অন্তর নিরীহ নিহত মানুষের হত্যাকান্ডে, অথচ তাদের অজ্ঞাতসারে কিরূপ মৈত্রী-করুণায় বিগলিত হয়েছিল,-তা তো সাধারণের কল্পণার অতীত। এতে

সমগ্র বিশ্বে প্রদর্শিত হল কিরূপে অহিংস নীতির মাধ্যমে অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া যায়?

আশুতোষ দেবের বাংলা অভিধান।

এগার

পরবর্তী কালে শান্তি নিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক গোঁসাইকে (নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী) বৌদ্ধধর্মে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ শিক্ষা সংস্কৃতি প্রধান সিংহল ও বার্মা দেশে পাঠিয়েছিলেন। গোঁসাইজী দু'বছর কাল সেখানে অবস্থান পূর্বক পালিভাষা সাহিত্য ও বৌদ্ধ দর্শনে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়ে শান্তি নিকেতনে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। এতেও কবিগুরুর বৌদ্ধ শিক্ষানুরাগ ও বৌদ্ধপ্রাণতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

ডঃ সুধাংশু বিমল বড়ুয়া

বার

একদিন রবীন্দ্রনাথ ঘরের বারান্দায় বসে আছেন। এমন সময় একটি মুরগী ধাবমান হয়ে কবিগুরুর সামনে এসে পড়ল। পরে তিনি জানতে পারলেন যে এই মুরগীকে হত্যা করার জন্য আয়োজন চলছিল। হত্যাকারীর হাত থেকে হঠাৎ ছুটে এসে প্রাণ বাঁচাবার জন্য ধাবিত হয়ে যাচ্ছিল। এই দৃশ্য কবিগুরুকে ব্যথিত ও অভিভূত করল। সে দিন থেকে তিনি মুরগীর মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। *যদি এই কথা সত্য হয়, তবে সহজে অনুমান করা যায় যে, তাঁর* প্রাণ কিরূপ বৌদ্ধসংস্কৃতিসমন্বিত ও বৌদ্ধ নীতিআদর্শপরায়ণ ছিল।

ডঃ রাধারমন জানা

তের

একদিন একটি হিন্দুস্থানী বাচ্চা ছেলে বোলপুর শান্তিনিকেতন গিয়েছিল। বাড়ী থেকে আসার সময় তার মা তাকে একটা আধুলি হাতে দিয়ে বলেছিল-এই পয়সাটা কোন একজন ভিখারীকে দান করে দিবি। পরদিন সকালে কবি যখন প্রাতঃ-ভ্রমণে বের হয়েছিলেন, মাথায় দীর্ঘ চুলের উপরে গোলটুপি, গোফ দাঁড়ি বিশিষ্ট মুখ মন্ডল, গায়ে দীর্ঘ আলকাল্লা। কবিকে দেখেই বাচ্চাটি আধুলি হস্তে দৌড়ে গিয়ে কবির হস্তে অর্পণ করল এবং খুবই খুশীল হল। কবি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করলেন। শেষ পর্যন্ত কবি জানতে পারলেন যে তার মায়ের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে ভিখারী মনে করলেন বিশ্ব কবিকে।

কবি এই ছোট ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে বাচ্চাটির চিত্তের শ্রদ্ধা ও অতি সারল্যের বর্ণনা করলেন যে দান বিত্ত প্রধান নয়, চিত্ত প্রধান। ইহাইতো বৌদ্ধনীতি আদর্শের চরম অভিব্যক্তি।

গ্রন্থপঞ্জী

১। সংযুক্ত নিকায় - মৌলিক সূত্র পিটক গ্রন্থ

২। অঙ্গুত্তর নিকায় - " " " "

৩। বিশুদ্ধি মার্গ - আচার্য বুদ্ধঘোষ

৪। বোধিচর্যাবতার - আচার্য শান্তিদেব
অনূদিত -শ্রী জ্যোতিঃপাল মহাথের

৫। চর্যাপদ - বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য

৬। বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন - পণ্ডিত-শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির

৭। রবিরশ্মি - চারুচন্দ্র বন্দোপধ্যায়

৮। জাতকমালা - ঈশান চন্দ্র ঘোষ

৯। রবীন্দ্র রচনাবলী - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০। রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি - ডঃ সুধাংশু বিমল বড়ুয়া

১১। পালি ভাষা সাহিত্য
বৌদ্ধদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ - ডঃ রাধা রমন জানা

১২। সাহিত্য সন্দর্শন - শ্রীশ চন্দ্র দাশ

১৩। সত্যদর্শন - মহাপণ্ডিত বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির

১৪। ধর্মপদ - মৌলিক সূত্র পিটক গ্রন্থ

১৫। সূত্র নিপাত - " " " "



লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১. কর্মতত্ত্ব
২. পুদ্‌গল প্রজ্ঞপ্তি (চ.বি. পালি বিভাগে পাঠ্য)
৩. মালয়েশিয়া ভ্রমণ কাহিনী
৪. বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে
৫. বোধি চর্য্যাবতার (চ.বি. পালি বিভাগে আংশিক পাঠ্য)
৬. সাধনার অন্তরায়
৭. বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা
৮. সৌম্য সাম্যই শান্তির কারণ
৯. প্রজ্ঞাভূমি নির্দেশ (চ.বি. পালি বিভাগে পাঠ্য)
১০. ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান পতন
১১. ব্রহ্মবিহার
১২. চর্য্যাপদ (চি.বি. বাংলা বিভাগে পাঠ্য)
১৩. বুদ্ধের জীবন ও বাণী
১৪. গুরুদেব গুণালংকার মহাস্থবিরের জীবনী
১৫. রবীন্দ্র সাহিত্যে বৌদ্ধ সংস্কৃতি